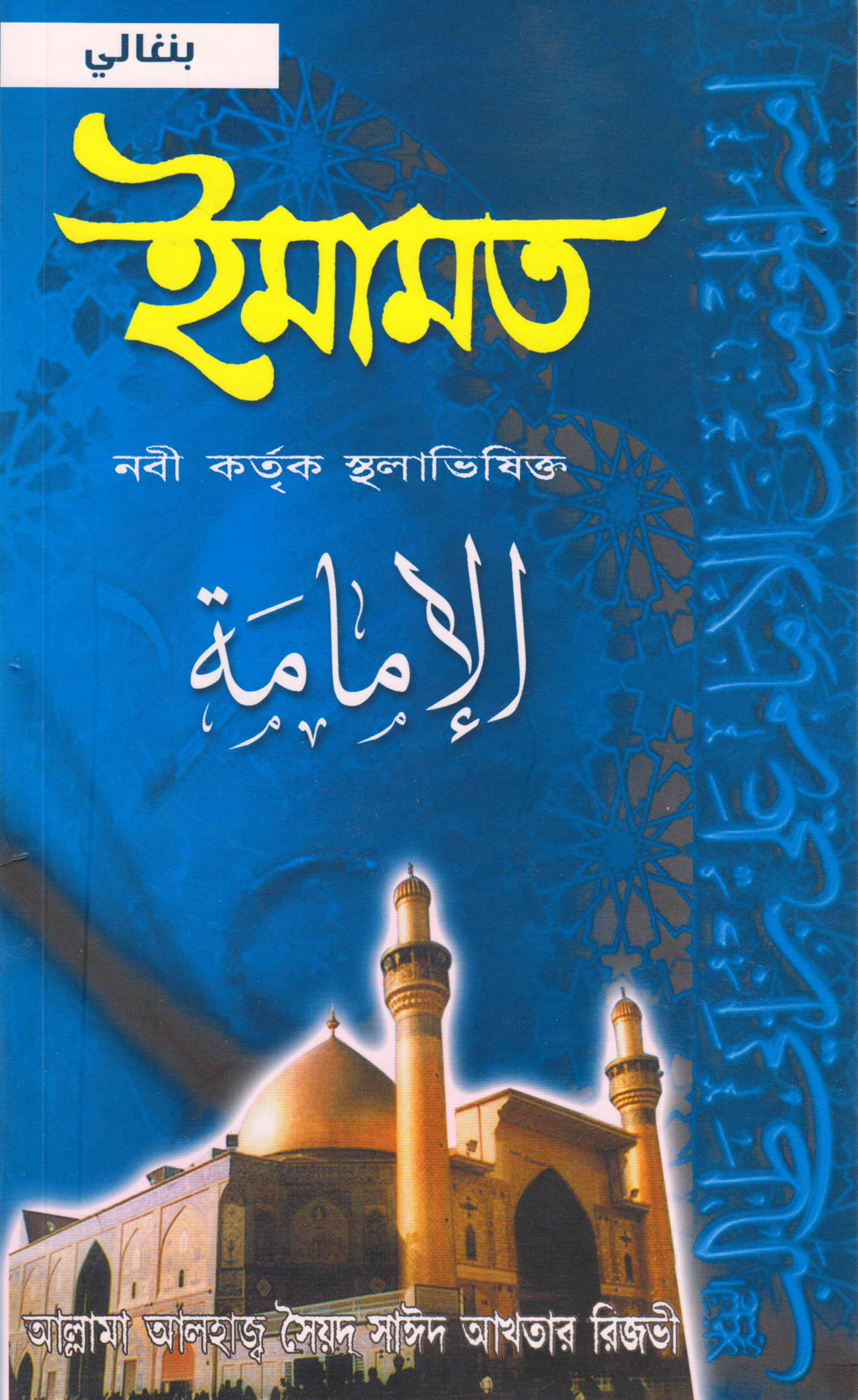

بنغالي
ইমামত
নবী কর্তৃক স্থলাভিষিক্ত
الإِمَامَة
আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ্ সাঈদ আখতার রিজভী

ভাসাদই

ভাপীভীাস্ত্র কর্তৃক চিন

ঃ লসু

ভিয়চী চাতভাত নর্হীর নয়র্স্ত্র চ্যাতকাত াসাল্লাত

দস্তাভ্র ন দ ক ঃ কনাচনুাত



দশকাগীচাং চাচচাক

ইমামত

নবী কর্তক স্থলাভিষিক্ত

মুল ঃ আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ সাঈদ আখতার রিজভী

অনুবাদক ও সম্পাদনায়ঃ

ক. ম. দ. হোসেন

প্রথম প্রকাশঃ
রবিউল আউয়াল ১৪১৫ হিজরী
ভাদ্র ১৪০১ বাংলা
সেপ্টেম্বর '৯৪ ইং

প্রকাশনায়
কাররার পাবলিকেশন
৯-৫/১২, মিরপুর
ঢাকা-১২১৬

মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

IMAMATE Written by Allamah Al-Hajj Sayyid Saeed Akhtar Rizvi from English to Bengali by K.M.D. Hussain, Publish by Karrar Publication.

Price. Tk 30 only.

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

ভূমিকা

বাংলা প্রকাশকের কথা

প্রথম পর্ব ঃ সাধারণ অর্থ

১. ইমামত ও খিলাফত এর তাৎপর্য

২. পার্থক্যের সারসংক্ষেপ

৩. মৌলিক পার্থক্য

৪. ইসলামী নেতৃত্বের পদ্ধতি

দ্বিতীয় পর্ব ঃ শীয়া দৃষ্টিকোণ

৫. ইমামতের প্রয়োজনীয়তা এবং একজন ইমামের যোগ্যতা

(ক) ইমামতের প্রয়োজনীয়তা

(খ) শ্রেষ্ঠত্ব (আফযালিয়াৎ)

(গ) ভ্রান্তিহীনতা (মাসুম)

(ঘ) আল্লাহর তরফ হতে নিয়োগ

(১) কোরআনের আয়াত

(ঙ) অলৌকিক ক্ষমতা

পূর্ব দৃষ্টান্ত

যৌক্তিক কারণ

ইমামদের পবিত্রতা

৬. ইমামদের ভ্রান্তিহীন

৭. ইমাম আলী (আঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব

৮. ইমাম আলী (আঃ) এর মনোনয়ন

৯. প্রভুত্বের আয়াত (বেলায়েত)

১০. গাদির খুম এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

(১) গাদিরের হাদীস (বিশুদ্ধ)

(২) গাদিরের হাদীস এর বর্ণনাকারী

(৩) মাওলার সাধারণ অর্থ
(৪) এই অনুষঙ্গে মাওলার অর্থ
১১. ইমাম আলী (আঃ) নবীর 'সত্তা'
১২. ঐতিহ্যসমূহ
১৩. উলেল আমারকে অবশ্যই মাসুম হতে হবে
১৪. উলেল আমার এর অর্থ কি মুসলিম শাসক
১৫. উলেল আমার এর সঠিক অর্থ
১৬. বার জন খলিফা বা ইমাম
১৭. বার জন ইমামগণের বিষয়ে কিছু তথ্য
তৃতীয় পর্বঃ সুন্নী দৃষ্টিকোণ
১৮. খিলাফত বিষয়ে সুন্নী দৃষ্টিকোণ
১৯. খলিফার যোগ্যতা
২০. আবু বকর এর ক্ষমতায় আরোহণ
২১. সংক্ষিপ্ত সমালোচনা
২২. ওমরের মনোনয়ন
২৩. আশ শুরা নির্বাচকমন্ডলী
২৪. সামরিক ক্ষমতা
২৫. সাধারণ আলোচনা
২৬. বাস্তব পরিস্থিতি
২৭. ওয়ালিদ এবং হারুন আর-রশিদ
২৮. আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা এবং আম্বীয়াদের পবিত্রতা বিশ্বাসের উপর খিলাফত্বের বৈপরিত্ব প্রভাব।
২৯. শীয়া মতবাদ কি অগণতান্ত্রিক
৩০. একটি বংশীয় শাসন
গ্রন্থপঞ্জী

লেখক পরিচিতি

আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ সাঈদ আখতার রিজভীর জন্ম ১লা রজব ১৩৪৫ হিজরী (৫ই জানুয়ারী ১৯২৭ খ্রীঃ)। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা হাকীম আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হাসান। ভারতের বিহারের সিওয়ান জেলার গোপালপুরের (ডাকঘরঃ বাকরগঞ্জ) তাঁর পূর্বপুরুষের আবাসভূমিতেই তিনি পড়াশুনা শুরু করেন এবং পরে যথাক্রমে পাটনা ও বেনারসে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বেনারসের জামেউল উলম জাওয়াদিয়া থেকে ধর্মতত্ত্বে সর্বোচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ বোর্ডের অধীনে আরবী, ফারসী ও উর্দূ বিষয়ে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এছাড়াও তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

তিনি নাজাফ (ইরাক) ও কুম (ইরান-এর বহু খ্যাতনামা আয়াতুল্লাহদের কাছ থেকে রিওআয়াৎ (নবী পরম্পরার ধারা বর্ণনা)-এর ইজাজত স্বীকৃত কর্তৃত্বভার, কাজাওয়াত (বিচার ভার) এবং উমুর-ই-হাসাবিয়া (মুজতাহিদদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য যেসব ক্ষমতা প্রভৃতি) উপাধি লাভ করেন।

তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি উর্দূ, আরবী, ইংরেজী, সোয়াহিলি এবং ফারসী ভাষায় লেখেন, কথা বলেন অথবা বক্তৃতা দেন। এ ছাড়াও হিন্দি ও গুজরাটি ভাষাতেও তার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। বর্তমানের এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি লিঙ্গয়াফোনের মাধ্যমে স্প্যানিশ ভাষা শিখছেন।

তিনি তাঁর বালক বয়েস থেকে নিজেকে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক উৎকর্ষতার সাথে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন।

তাঁর পিতার মত তিনিও (১৯৪৮-৫১ পর্যন্ত) উত্তর প্রদেশের বসতি জেলার হালোরে ইমাম-এ-জামাত ছিলেন। তিনি সিওয়ান জেলার হুসাইনগঞ্জের হুসাইনগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের উর্দূ এবং ফারসী শিক্ষক হিসেবে (১৯৫২-১৯৫৯ পর্যন্ত) কর্মরত ছিলেন। এই বছর ক'টিতে তিনি

নিজস্ব যে সময়টুকু পেয়েছিলেন, তাও তিনি ব্যয় করেছেন আনজুমান-ই-তারাকি-ই-উর্দূ, জেলা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতি এবং আনজুমান-ই-ওয়াজিফা-ই-সাদাত-ও-মোমেনিন-এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি তানজানিয়া (পরে টাঙ্গানিকা) যান এবং আবাসিক আলেম হিসেবে তিনি লিনডি (Dec ১৯৫৯-১৯৬২) আরুসা (১৯৬৩-১৯৬৪) এবং দার-এস-উস-সালাম (১৯৬৫-এপ্রিল ১৯৬৯) এ কর্মরত ছিলেন।

আফ্রিকা পৌঁছুবার এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সোয়াহিলি ভাষা শিখতে শুরু করেন এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইসলামের সত্য প্রচারের উপযোগিতা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। সে সময়টায় পুরো মহাদেশের ভেতর একজনও শীয়া ইসনা আশারী ছিলো না। ১৯৬২-তে তিনি 'তাবলীগ'-এর পরিকল্পনা করে খোজা শীয়া ইসনা আশারীদের সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সচিবালয়ে তা পাঠিয়ে দেন। সে সময় তা ছিলো আরুশায়। ১৯৬৩-তে তাকে আরুশায় বদলী করে এনে পূর্ণ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে পর্যায়ে তা হয়তো প্রয়োগ করা সম্ভব ছিলো না তাই একটি পাইলট স্কীম গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৪তে সচিবালয় থেকে মাওলানার প্রদত্ত স্কীমের উপর ভিত্তি করে টাঙ্গায় আফ্রিকার খোজা শীয়া ইসনা আশারীদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তসহ একটা পূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এভাবেই বেলাল মুসলিম মিশনের জন্ম।

এই মিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আফ্রিকায় হাজার হাজার লোক শীয়া বিশ্বাসে দীক্ষিত হয়। ক্রমে ক্রমে শিক্ষাদান, প্রচার-প্রকাশনা এবং প্রতিনিধি সূত্রে যোগাযোগের কারণে মিশনের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বেড়ে গিয়ে পূর্বে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাপান এবং পশ্চিমে ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষ প্রতিনিধির কার্যক্রমের মাধ্যমে গায়নায় জনাব রীতফ আলীর অধীনে একটা জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং তিনি সফলভাবেই ত্রিনিদাদ ও টোবাগো পর্যন্ত এই বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত এর সুপ্রীম কাউন্সিল তাঞ্জানিয়ায় বেলাল মুসলিম এবং

কেনিয়ায় বেলাল মুসলিম মিশন নামে স্বতন্ত্রভাবে দু'টি স্বাধীন সংস্থা স্থাপন করে। পরে বেলাল মুসলিম মিশন থেকে ব্রুন্ডি ও মাদাগাস্কারে ডু-ব্রানডিয়াস্ত মিশন ইসলামিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মিশনের ফলে তাঞ্জানিয়া ও কেনিয়ায় কেন্দ্র স্থাপতি হয়। প্রচারকদের জন্য সেখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়-এদের বৃহত্তম কেন্দ্র হলো দার-উস-সালাম। কেনিয়াতে একটি প্রাইমারী স্কুল ও বেশ কিছু নার্সারী স্কুল ও কোরআনী মাদ্রাসা খোলা হয়। এর সাথে মিশন তিনটি প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে, যার ফলে শীয়া মতবাদ আরো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঞ্জানিয়া ও কেনিয়ার মিশন ইংরেজী ও সোয়াহিলি ভাষায় সত্তরটি গ্রন্থ প্রকাশ করে যেগুলো অধিকাংশই হলো মাওলানার লেখা কিংবা তার অনুবাদ।

১৯৭৮ সালে ভারতে ফিরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং মরহুম আল্লামা তাবাতাবাঈ এর জাফর আলী আশারীয়া এর আমন্ত্রণে লন্ডন যান। লন্ডনে তিনি মরহুম হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ মুহম্মদ মাহদী আল হাকীমের সাথে 'বিশ্ব আহলে বায়াত ইসলামী লীগ' (WABIL)-এর প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করেন। তিনি এই লীগের ছয়জন প্রতিষ্ঠাতা ও তিনজন ট্রাস্টির একজন। (WABIL)-এর সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের যে কমিটি নির্ধারণ করা হয়, তার প্রধান ছিলেন এবং তিনি এর প্রথম সংবিধানগত সম্মেলন পরিচালনা করেন। ৩০টি দেশ থেকে ৮০ জন অভ্যাগত নিয়ে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে। সেই সম্মেলনে তিনি দুই বছরের জন্য মহাব্যবস্থাপক নির্বাচিত হন।

এখন পর্যন্ত তিনি ইংরেজীতে ৪২টি, উর্দূতে ১৫টি এবং আরবীতে ২টি গ্রন্থ রচনা করেন যাদের ৪১টির নাম এই বইয়ের শেষে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার কিছু কিছু কাজ জাপানী, ইন্দোনেশীয়, থাই, বর্মী, উর্দূ, গুজরাটি, ফারসী, সোয়াহিলি, ইতালীয়, হাউসা (নাইজেরীয় ভাষা) এবং ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি তাঞ্জানিয়া ও ভারতে নিজের সময়কে ভাগ করে কাজ করে যাচ্ছেন।

ভূমিকা

দার-উস-সালাম এ তাঞ্জানিয়ার বিলাল মুসলিম মিশন এর পরিচালিত Islamic Corespondence converse (ICC)-এর একটি অংশরূপে ১৯৭১ সালে এই গ্রন্থ রচনা করা হয়। এই গ্রন্থটি তারপর জনপ্রিয়তা পেলে ১৯৭৪ সালে তেহরানে World Orgaisation for Islamic Services (WOFIS) (পরে যারা 'এক দল মুসলিম ভাই' নামে পরিচিত হন) এই গ্রন্থের বিশ্বব্যাপী প্রকাশনা ও পরিবেশনার কাজ করেন এবং বহু গ্রন্থ ও পুস্তিকায় এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। ভারতের মুসলিম রিভিউ (লক্ষ্মৌ) এর একটি সংখ্যায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্ ও ১৪ জন মাসুমীন (আঃ)এর অশেষ দয়ায় এই গ্রন্থটি অগণিত মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটি সোয়াহিলি ও উর্দূ ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

যেহেতু বইটি মূলতঃ একটি কোর্সে পাঠ্যক্রম হিসেবে লিখিত তাই এতে আলোচিত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যপঞ্জী এতে ছিলো না কিন্তু বিশ্বব্যাপী এর পরিবেশনায় এই প্রয়োজনটি অনুভূত হয়। আমার বড় ছেলে, হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ মুহম্মদ রিজভী (ভ্যাংকুভার, কানাডা) অশেষ পরিশ্রমের সাথে এই কাজটি করেন এবং বিষয়টিকে আরো সহজবোধ্য করে তোলার জন্য এর সাথে আমার আরো কিছু রচনাকে যুক্ত করেন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও সুন্নী বিশ্বাস এবং গাদিরে খুম এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় এর উল্লেখ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সুন্নী গ্রন্থাবলী হতেই করা হয়েছে। এমনকি যখন একটি পাদটীকায় মরহুম আল্লামা আবদুল হুসাইন আল আমিনি এর উল্লেখ করা হয়েছে তখন 'আল গাদিরের' উক্ত পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সুন্নী গ্রন্থমালার ও উল্লেখ করা হয়েছে।

WOFIS ১৯৮৫ সালে এই টিকাটিপ্পুনীসহ বর্ধিত কলেবরের গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ভারতীয় যুবকদের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদায় বোম্বের জনাব ইমরান আবদুল রসুল এই গ্রন্থের পূর্ণ প্রকাশের দায়িত্ব নেন, যেহেতু এই বিশেষ চাহিদা পূরণের মতো অবস্থান WOFIS-এর নেই। ঘটনা ক্রমে এই ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ হয় ১৪১০ হিজরীতে যখন পুরো মুসলিম বিশ্ব গাদিরের চতুর্দশ শতবার্ষিকী' পালন করছে। আল্লাহ জনাব আবদুল রসুল এবং তার দলকে দু'জগতেই সমৃদ্ধি ও সাফল্য দেন এবং তাদের আরো আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে ইসলাম রক্ষার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সৈয়দ সাঈদ আকতার রিজভী

বাংলা প্রকাশকের কথা

বোম্বে (ভারত) থেকে প্রকাশিত আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ সাঈদ আখতার রিজভী ইংরেজী বই ইমামত-এর এটা বাংলা অনুবাদ। বাংলা ভাষায় ইমামত বা খিলাফতের উপর লেখা ও অনুবাদিত এমন বই এর আগে প্রকাশিত হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। মূল বই থেকে বিশ্বের অনেক দেশে অনেক ভাষায় অনুবাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ইমামত ও খিলাফত বিষয়ে কোরআন, হাদীস ও ইতিহাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে মুসলমানদের মূল দুই দল শীয়া ও সুন্নীর ইমাম ও খলিফাদের রূপ, গুণ ও যোগ্যতার নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য ইমামত বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছি।

এই বই বাংলা ভাষাভাষি সন্ধানী ও চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞানের পরিধিকে আরও বাড়িয়ে দিবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং এই বই পাঠক-পাঠিকাদের চিন্তার খোরাকতো হবেই ও সত্য পথের দিশারী রূপে কাজ করবে।

মূল গ্রন্থকার যে পরিশ্রম করে ইমামত ও খিলাফত বিষয়ে কোরআন, হাদীস ও ইতিহাস থেকে যে তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছেন এবং মুসলমানদের মূল দুই দল শীয়া ও সুন্নীর দৃষ্টিভঙ্গি যেরূপ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাকে জানাই আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ।

বিঃ দ্রঃ এই ইমামত বই প্রকাশের আগে এই প্রকাশকের আরো ৬টি বই অন্যান্য ব্যক্তিও প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রথম প্রকাশক তার নিজের নাম ও প্রকাশনার মাধ্যমে ইমামত বই প্রকাশ করছে।

প্রকাশক

প্রথম পর্ব

সাধারণ অর্থ

১. ইমামাত এবং খিলাফাত এর তাৎপর্য

'আল ইমামাহ' এর আক্ষরিক অর্থ নেতৃত্ব দেয়া আর আল ইমাম অর্থ হলো নেতা। ইসলামী পরিভাষায় আল ইমামাহ (ইমামত) এর অর্থ হচ্ছে মহানবীর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইহজগতের ধর্মীয় ও পার্থিব সকল কিছুর সার্বজনীন কর্তৃত্ব।– *(আল্লামা আল হিল্লীঃ আল বাবু'ল হাদী আশার ইংরেজী অনুঃ ডব্লিউ. এম, মিলার পৃষ্ঠা ৬২: মুঘনিয়াহঃ ফলসাফত ইসলামিয়াহ পৃষ্ঠা ৩৯২।)* আর 'আল ইমাম' অর্থ মহানবীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই ব্যক্তি, যাঁর উপর জগতের ধর্মীয় ও পার্থিব সকল কিছুর পরম ক্ষমতার দায়ভার ন্যস্ত।

'ব্যক্তি' শব্দটির তাৎপর্য এই যে, একজন মহিলা কখনো ইমাম হতে পারবেন না। যারা দৈনন্দিন নামাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন তারাও এই পরম ক্ষমতার বহির্ভূত; যদিও তাদের বলা হয় 'নামাজের ইমাম'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরম ক্ষমতার অধিকারী তারা নন। 'মহানবীর উত্তরাধিকারী' শব্দটি নবী এবং ইমামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

ইমাম সরাসরি এই কর্তৃত্ব পান না, বরং নবীর একজন উত্তরসূরী হিসেবে গণ্য হয়েই এটি পান। আল খিলাফাহ শব্দের অর্থ 'কৃতকার্য হওয়া' আর আল-খলিফাহ অর্থ 'উত্তরসূরী'। ইসলামী পরিভাষায় আল খিলাফাহ ও আল খলিফাহ যথাক্রমে আল ইমামাহ ও আল ইমাম এর অর্থ বহন করে।

আল 'ওয়াসিয়ার' অর্থ নির্দেশ করা আর 'আল ওয়াসি' অর্থ নির্দেশ দানকারী। মুসলমানদের রচনায় দেখা যায় এই শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে 'আল খিলাফাহ' (প্রতিনিধিত্বকারী) ও 'আল খলিফা' (প্রতিনিধি)।

এটা অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো যে, পূর্ববর্তী বহু নবী তাদের পূর্বতন নবীদের খলিফা এবং এভাবে তারা নবী ও খলিফা উভয়ই কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যান্য নবীরা (যারা নতুন শরীয়াহ তৈরী করেছেন) তারা কিন্তু কোন পূর্বতন নবীর খলিফা নন। তাদের ভেতরও নবীর খলিফা ছিলো যদিও তারা নিজেরা নবী নন।

ইমামত ও খিলাফত এর প্রশ্নটিই মুসলিমদের ঐক্যে বিভেদ তৈরী করে কিছু কিছু গোষ্ঠীর চিন্তা চেতনা এবং দর্শনকে এমনভাবে আক্রান্ত করেছে যার থেকে আল্লাহর ন্যায়বিচার ও নবীদের নিষ্পাপ (ইসমাত) পর্যন্ত রেহাই পায়নি।

ইসলামী ধর্মতত্ত্বে এটিই সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। খিলাফত বিষয়ে মুসলমানরা রচনা করে গেছেন হাজার হাজার বই। আমার সামনে যে সমস্যাটি দেখা দিলো কি লিখবো তা নিয়ে নয় বরং কি লিখবো না তা নিয়ে। এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবরে এই বিষয়ের সমস্ত অনুষঙ্গগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রায় অসম্ভবই; সুতরাং এ বিষয়েই অনেক ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম প্রশ্নের কথা যা আগেই লিখা হয়েছে তার তো প্রশ্নই ওঠে না। এই গ্রন্থে কেবল খিলাফত বিষয়ক বিভিন্ন মতাদর্শের নাতিদীর্ঘ আলোচনা থাকবে।

এ প্রশ্নে মুসলমানরা দু'টি বৃহত্তর গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছে তারা হলেন এক সুন্নী, যারা বিশ্বাস করেন নবীর ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা আবু বকর এবং দুই হলো শীয়া, যারা বিশ্বাস করেন ইমাম আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হলেন ইসলামের প্রথম ইমাম ও খলিফা।

এই মৌলিক পার্থক্যটি আর যে সমস্ত বিভেদ তৈরী করেছে সেসব পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত হবে।

২. পার্থক্যের সারসংক্ষেপ

মহানবী (সাঃ) এক হাদীসের প্রতি সকলই এক মত যে, তা হলো আমার উম্মাহ (অনুসারীরা) অচিরেই তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং কেবল একটি বাদে আর সবগুলি বাতিল হবে। *(আল খাতিব আত-তাবরিজীঃ মিশকাতুল মাসাবিহ ইংরেজী অনুঃ জেমস রোবসন খন্ড-১ পৃষ্ঠা ৪৫; আল মজলিশি একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে সংকলিত, এই বিষয়ের ঐতিহ্যসমূহ রয়েছে বিহারুল আনওয়ার খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা ২-৩৬; আল কুমী শ. আব্বাসঃ শফিনাতুল বিহার খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৫৯-৬০।)*

যারা আত্মার সত্যিকার মুক্তি চান তারা এতকাল এ বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, কেবল মুক্তির এই পথটি খুঁজে পেতে, আর বাস্তবিক পক্ষে প্রতিটি মানুষের সত্যে না পৌঁছানোর হতাশায় দমে না গিয়ে, যুক্তি নির্ভর হয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন তার সামনে থাকবে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক পার্থক্যগুলি, যেগুলো কোন ভক্তি বা সংস্কার থেকে উদ্ভূত না এবং আল্লাহর কাছে সত্যপথের প্রার্থনা করে চিন্তাশীল মন নিয়ে এই প্রশ্নের বিভিন্ন দিক পুংখানুপুংখরূপে বিচার করবেন।

যে কারণে আমি এখানে সঠিক সমাধানে পৌঁছুনোর লক্ষ্যে প্রতিটি দলের বিভিন্ন যুক্তিকে, মূল পার্থক্য ও মতদ্বৈততার সাথে সাথে যুক্তি তর্ক এবং কারণসমূহ বর্ণনা করে গেছি।

১. নবীর উত্তরসূরী নির্ধারণের দায়িত্ব কি আল্লাহর নাকি উম্মাহ (অনুসারীদের)র যে যাকে খুশি তারা নবীর উত্তরসূরী মনোনীত করবে?

২. অপরক্ষেত্রে আল্লাহ কিংবা নবী কি উম্মাহর হাতে খলিফা নির্ধারণের পদ্ধতিগত নীতিমালা ও আইনকানুন তুলে দিয়েছে, নাকি উম্মাহ নিজেদের মতৈক্যের মাধ্যমে নীতিমালা নির্ধারণ করে সেই মোতাবেক কাজ করবে, নাকি উম্মাহ'র সে সময় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে নীতি সুবিধাজনক মনে হবে তাই-ই গ্রহণ করবে? সে রকম করার অধিকার কি তাদের আছে?

৩. কি কি যুক্তি এবং ঐশ্বরিক নির্দেশ একজন ইমাম বা খলিফার হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করে? যদি করে তবে সেগুলো কি?

৪. ইসলামের নবী কি সত্যিই তার উত্তরসূরী এবং খলিফা হিসেবে কাউকে মনোনীত করে গেছেন, নাকি না? যদি তিনি তা করেই থাকেন তবে কাকে? আর যদি না করেই থাকেন, তবে কেন?

৫. নবীর ইন্তেকালের পর কে তার খলিফা মনোনীত হলেন আর খলিফা হবার সকল যোগ্যতাও কি তার ছিলো? *(নাজমুল হাসানঃ আন নবুয়্যাহ ওয়াল খিলাফাহ অনুঃ লিকা আলী হায়দারী পৃষ্ঠা২-৩)*

৩. মৌলিক পার্থক্য

যদি আমরা ইমামত ও খিলাফতের প্রকৃতি ও চরিত্র বিষয়ে উদ্ভূত মৌলিক পার্থক্যগুলোর গোড়া থেকে শুরু করি তাহলে বোধ হয় তা কম সময়সাপেক্ষে হবে। ইমামতের প্রাথমিক চারিত্র বৈশিষ্ট্য কি? একজন ইমাম কি সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে একটা রাজ্যের শাসক? নাকি তিনি সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতিনিধি ও মহানবীর উত্তরসূরী?

যেহেতু ইমামত ও খিলাফতকে সাধারণভাবে নবীর ক্রমপরম্পরা বলে মেনে নেয়া হয়, তাই একজন নবীর মৌলিক কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে না এলে উপরের প্রশ্নটির উত্তর দেয়াও সম্ভব নয়। প্রথমেই আমাদের স্থির করে নেয়া প্রয়োজন যে একজন নবী সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম রাজ্যের শাসক না আল্লাহর প্রতিনিধি।

ইসলামের ইতিহাসে আমরা এমন একটি দলের সন্ধান পাই যারা নবীর এই কার্যক্রমকে একটি রাজ্য স্থাপনার চেষ্টা বলে অভিহিত করে। তাদের চিন্তাভাবনা বস্তুবাদী, তাদের আদর্শ হলো সম্পদ, সৌন্দর্য ও ক্ষমতা। তাই তারা, স্বাভাবিকভাবেই এই উদ্দেশ্যটি মহানবীর উপরও চাপানোর চেষ্টা করেছে ও করছে।

আবু সুফিয়ানের শ্বশুর উৎবাহ ইবনে রবিয়াহকে কুরাইশদের বার্তা জানানোর জন্য মহানবীর কাছে পাঠানো হয়েছিলোঃ "মুহাম্মদ! তুমি যদি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চাও তবে তোমাকে আমরা মক্কার শাসনকর্তা বানাতে পারি। তুমি কি কোন বড় পরিবারে বিয়ে করতে চাও? তুমি এ জায়গায় সুন্দরী শ্রেষ্ঠার পানি গ্রহণ করতে পারবে।. তুমি কি সোনা আর রৌপ্যের গুপ্ত ভান্ডার চাও? আমরা তোমাকে এ সবকিছু তো বটেই এমনকি তারচে'ও বেশী দেবো। কিন্তু তার বদলে তোমাকে তোমার ধর্ম প্রচার থামাতে হবে যে ধর্মে বলে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা, যেসব দেবদেবীর পূজো করেছেন, তারা সবাই ভ্রান্ত।"

কুরাইশরা প্রায় নিশ্চিতই ছিলো যে মুহম্মদ (দঃ) এ প্রস্তাবে রাজি হবেই। কিন্তু প্রত্যুত্তরে মহানবী সুরা ফাসাল্লাত-১৩ তিলাওয়াৎ করলেন যার ভেতর ছিলো-

হে নবী) বলিয়া দিন, যদি তাহারা (কাফেররা) আপনার হইতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তা, হলে—আমি তোমাদের বজ্রপাতের আযাব (শাস্তি) থেকে সতর্ক করছি, যা আদ এবং সামুদ জাতির উপর নিপোতীত করেছিলাম।

এই স্পষ্ট উত্তরে উৎবা হতভম্ব হয়ে যায়। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু কুরাইশদের এসে সে পরামর্শ দেয় যেন মুহম্মদ (দঃ)কে এক ঘরে করে অন্য কোন গোত্রে পাঠিয়ে দেখা যাক, সে কি করে। কুরাইশরা ধরেই নেয় মুহম্মদ (দঃ) তাকেও যাদু করেছে। *(ইবনে হিশামঃ আশ শিরাহ আন নবীয়াহ খন্ড-১ পৃষ্ঠা ৩১৩-১৪।)* সে এভাবে মুহম্মদ (সাঃ) কে অন্য গোত্রের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল। পক্ষান্তরে দেখা যায় মহানবী যখন হিজরতে মদিনায় আসেন তারপরও কুরাইশরা তার সাথে একের পর এক যুদ্ধ বাঁধিয়ে যেতে থাকে, তা দেখে অন্যান্য গোত্রগুলো ভাবতে থাকে মুহম্মদ (সাঃ)কে তার নিজের গোত্রেই ফেরত পাঠানো ভালো। আমর ইবনে সালমা নামে এক সাহাবী বলেন, আরবরা কেবল কুরাইশদের জন্যই ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে ছিলো, তারা প্রায় বলতো– "যে মুহম্মদকে (সাঃ) আগে তার নিজের গোত্রে ফিরে আসতে হবে–যদি সে তাদের উপর বিজয়ী হয়ে আসতে পারে, তবে অবধারিতভাবেই বুঝতে হবে যে সে সত্য একজন নবী। যখন মক্কা বিজিত হয় তখন সেসব গোত্রগুলো সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করে।" *(সহি বুখারীঃ খন্ড-৫ পৃষ্ঠা ১৯১, ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খন্ড-৫ পৃষ্ঠা ৪০।)*

এভাবে তাদের মতে, বিজয়ই হলো সত্যের বৈশিষ্ট্য! যদি মুহম্মদ (দঃ) যুদ্ধে হেরে যেতেন তবে তিনি সবার কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকতেন!!

মুহম্মদ (সঃ) এর ঐশী আগমন একটা জাগতিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়, এ ঘোষণা বহুবার দেয়া হয়েছে আবু সুফিয়ান ও তার গোত্র থেকে। মক্কা পতনের সময় মুসলমানদের শক্তির বহর টের পেয়ে আবু সুফিয়ান আগেই পালাতে গিয়ে হযরতের চাচা আব্বাসের হাতে বন্দী হয় তিনি তাকে হযরত মুহম্মদ (দঃ)–এর সামনে হাজির করিয়ে আবু সুফিয়ানের সম্মানজনক নিরাপত্তা দেবার কথা বলেন, হয়তো এতে সে ইসলাম গ্রহণ করলেও করতে পারে।

আবু সুফিয়ানের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই তিনি যখন তাকে মুসলিম সেনাদলের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রতিটি গোত্রের বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা লোকদের দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, ঠিক তখন নবী তার দলসহ সবুজ পোষাক পরে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আবু সুফিয়ান চীৎকার করে ওঠেঃ "হায় আব্বাস! তোমার ভাতিজা পুরো রাজ্যটা জয় করে ফেললো!" আব্বাস তার উত্তর দিলেন এই বলে যে, "তার কাছে বরং কৃতজ্ঞতা জানাও! এটা রাজত্ব নয়, এটা তার নবীত্ব।" *(আবুল ফিদা মুখতাসার খন্ড-১ পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৪; ইয়াকুবিঃ আত তারিখ খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৫৯।)*

এখানে আমরা স্পষ্টতই পরস্পর বিরোধী দু'টি ধারণা দেখতে পাই। আবু সুফিয়ান কখনোই তার নিজস্ব ধর্মমত পরিবর্তন করেনি। ওসমান যখন খলিফা হলেন তখন আবু সুফিয়ান তার কাছে এসে এই বলে উপদেশ দেয় যে "হে উমাইয়া বংশের সন্তানরা! এখন রাজত্ব তোমাদের হাতে এসে গেছে, একে নিয়ে তোমরা, শিশুরা যেমন করে বল খেলে তেমন করেই খেলো, একজনের হাত থেকে একে তুলে দাও গোত্রের অন্য কারো হাতে। রাজ্য একটা বাস্তবতা; আমরা জানি না এটা দোজখ বয়ে আনছে না বেহেশত।" *(ইবনে আবদিল বারঃ আল ইসতেয়াব খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৬৭৯; ইবনে আবদিল হাদীদ শেষ বাক্যটিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন, "তাঁর দ্বারা, যার নামে আবু সুফিয়ান শপথ করলেন যে কোনো শাস্তি বা গণনা নেই, কোন বাগান বা আগুন নেই পুনরুত্থান বা বিচারের দিন ও নেই।" (তাঁর শারহ নাহজুল বালাগাহতে খন্ড ৯ পৃষ্ঠা ৫৩,)*

তারপর সে ওহুদে ফিরে গিয়ে হযরত হামজার (হযরতের চাচা) কবরে লাথি মারতে মারতে বলতে থাকে "শোনো আবু ইয়া'লা! দেখো, যে রাজ্য বাঁচানোর জন্য লড়াই করেছিলে তা শেষে এখন আমাদের হাতে।" *(ইবনে আবদিল হাদীদঃ পূর্বোক্ত খন্ড-১৬ পৃষ্ঠা ১৩৬।)*

তার মতো একই মত পোষণ করতো তার বড় ছেলে ইয়াজিদ, সে বলেছিলো-বনু হাশিম রাজ্য পাবার জন্য কেবল একটা নাটক করলো মাত্র; প্রকৃতপক্ষে এতে (আল্লাহর বাণী) ওহী বা উপলব্ধি কোনোটাই এতে ছিল না। *(সিবতে ইবনে আল জাওজি তাজকিরাহ সম্পাদনাঃ এস, এম, এস বাহরুল উলম পৃষ্ঠা ২৬১; আত তাবারি, আত তারিখ খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা ২১৭৪।)*

যদি কোনো মুসলমান এমন ধারণাতে বিশ্বাসী হন, তাহলে তিনি ইমামতকে শাসকত্বের সাথে একই অর্থে দেখতে বাধ্য। আর সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নবীর প্রাথমিক দায়িত্ব হলো, শাসকের আর শাসনের রাশ ঠিক মতো ধরে রাখতে পারবে এমন যে কেউই তাঁর উত্তরসূরী হতে পারে।

কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আবার সমস্যা দাঁড়ায় যে প্রায় নব্বই শতাংশ নবীরই কারোরই কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিলো না; আর তাদের অধিকাংশকেই যার যার কালের রাজনৈতিক ক্ষমতার শিকার হতে হয়েছিল। তাদের খ্যাতি মুকুট আর সিংহাসনের নয়; তা বরং আত্মদানের যন্ত্রণার। যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শাসনভারই নবীত্বের প্রাথমিক শর্ত হতো, তাহলে সম্ভবতঃ ১,২৪,০০০ জনের মধ্যে শুধুমাত্র ৫০ জনের ভাগ্যেই এই রাজনৈতিক ক্ষমতার পদবীটি জুটতো না।

তাহলে খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, নবীর প্রাথমিক শর্ত কখনোই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া নয় বরং আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়া। আর এই প্রতিনিধিত্ব দানের ক্ষমতা মানুষের হাতে নয়, অবশ্যই আল্লাহর হাতে।

সেভাবে তাঁর উত্তরসূরীর ও প্রাথমিক শর্ত কখনোই রাজনৈতিক ক্ষমতা হতে পারে না বরং তাকেও আল্লাহ প্রতিনিধিই হতে হবে। সেই প্রতিনিধিত্ব দানের ব্যাপারটিও তার কোন অনুসারীর কাছ থেকে হতে পারে না, সেটিও আসতে হবে স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে। সংক্ষেপে, একজন ইমাম যদি আল্লাহর প্রতিনিধিই হন তবে তাঁর নিয়োগ হতে হবে আল্লাহর দ্বারা।

৪. ইসলামী নেতৃত্বের পদ্ধতি

একটা সময় ছিলো যখন মানুষের জানা সরকার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রাজতন্ত্রই ছিলো একমাত্র। তখন মুসলমান মনীষীদের রাজা ও রাজতন্ত্রের এই বলে সুনাম গাইতে হতো যে রাজা হলেন আল্লাহর ছায়া স্বরূপ যেন আল্লাহ সত্যি সত্যিই ছায়া দেন! এখন গণতন্ত্র বেশ প্রচলিত আর সুন্নী মনীষীরাও অক্লান্তভাবে লিখে চলেছেন হাজার হাজার প্রবন্ধ, পুস্তিকা আর গবেষণামূলক গ্রন্থ, এই বলে যে ইসলামী সরকার পদ্ধতিও আসলে গণতন্ত্রভিত্তিক। তারা এতদূর পর্যন্ত চলে গেছেন যে গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের কথা ভুলে বসে দাবী করছেন ইসলামই গণতন্ত্রের প্রবর্তক। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জেঁকে বসেছে আর অনেক জ্ঞানী মুসলিম মনীষী অক্লান্তভাবে বলে চলা সেই কথা শুনলেও অবাক হবো না যে, ইসলাম সমাজতন্ত্রের শিক্ষা দেয়। পাকিস্তানে এবং আরো কোথাও কোথাও অনেকে ইদানীং 'ইসলামী সমাজতন্ত্রের' ধুয়ো তুলেছেন। এই 'ইসলামী সমাজতন্ত্রের' কি অর্থ তা আমার জানা নেই। কিন্তু যদি এই লোকেরাই আর দশ-বিশ বছরের মধ্যে দাবী করে যে ইসলাম সাম্যবাদের শিক্ষা দেয়, তাহলেও আমি মোটেই আশ্চার্য হবো না!

হাওয়ার সাথে সাথে চলার এই মনোভাব সঠিক ইসলামী নেতৃত্বের সাথে প্রতারণা করছে। কিছুকাল আগে আফ্রিকার একটি দেশে মুসলিমদের সমাবেশে সম্মানিত অতিথি ছিলেন সে দেশের রাষ্ট্রপতি সেখানে এক মুসলিম নেতাকে বলতে শুনলাম 'আল্লাহকে মেনে চলুন, পীরদের মেনে চলুন, শাসনকর্তাকে মেনে চলুন', উত্তরে রাষ্ট্রপতি (ঘটনাক্রমে তিনিও একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক) আল্লাহ এবং আল্লাহর পীরদের মেনে চলার নির্দেশের এই গভীর জ্ঞানকে শ্রদ্ধা জানালেন কিন্তু 'শাসনকর্তা'কে মেনে চলার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। যদি একজন শাসক অন্যায়কারী ও অত্যাচারী হয়? ইসলাম কি তাহলে মুসলিমদের প্রতিরোধহীনভাবে সেই শাসককে মেনে চলার শিক্ষা দেয়?

এই চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নে তার সঠিক উত্তর দাবী করে। একে হালকাভাবে নেয়া ঠিক নয়। যার কারণ হলো, যে লোকটি এই তর্কের সূত্রপাত করেছে, সে কিন্তু তা মুলতঃ ঘটিয়েছে পবিত্র কুরআনের ভুল ব্যাখ্যার কারণে।

তাহলে আসুন ইসলামী নেতৃত্বের পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা যাক। এটা কি গণতান্ত্রিক? গণতন্ত্রের সবচে' ভালো সংজ্ঞা দিয়েছেন আব্রাহাম লিংকন তার মতে গণতন্ত্র হলো "সেই সরকার, যে জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য।"

কিন্তু ইসলামী সরকার 'জনগণের নয়', 'সরকার হলো আল্লাহর'। জনগণ কিভাবে নিজেদের পরিচালিত করতে পারে। তাদের নিজেদের মত আইন বানিয়ে নিজেদের চালাতে পারে; ইসলামে আইন প্রণয়ন জনগণ নয় আল্লাহ করেন। এই আইনগুলো জনগণের মতামত ও সম্মতি নিয়ে তৈরী হয় না বরং তৈরী হয় আল্লাহর নির্দেশ মত এবং নবীর মাধ্যমে। বিধি প্রণয়নে জনগণের বলার কিছু নেই; তাদের প্রয়োজন কেবল অনুসরণের, কোন মন্তব্য বা মতামতের প্রয়োজন নেই সেসব বিধিমালা ও আইনের বিষয়ে।

কোন মোমেন—মোমেনার এই অধিকার নাই যে, খোদা বা তার রাসুল (সাঃ) যখন কোন কাজের হুকুম দেয় সে ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুম অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। সুরা এহযাবঃ৩৬।

এবার আসা যাক 'জনগণের দ্বারা' এই শব্দবন্ধটিতে। দেখা যাক জনগণ কিভাবে নিজেদের পরিচালিত করে।তারা নিজেদের শাসক নিজেরা নির্বাচন করে নেয়। মহানবী, যিনি ইসলামী সরকারের পরিচালক, আইন

প্রণেতা এবং অধিকারী তিনি কিন্তু জনগণের নির্বাচিত নন। যদি মক্কাবাসীকে কাউকে নির্বাচিত করার অধিকার দেয়া হতো তবে তারা আল্লাহার নবী রূপে নির্বাচিত করতেন, হয় উরওয়া ইবনে মাসুদ (আত-তায়েফি) কিংবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাহ (মক্কী)কে!

এবং তারা বলতে লাগলো, "এই কুরআন কেন দুই জায়গার (মক্কাও তায়েফ) গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির গোত্র প্রধান উপর অবতীর্ণ করা হলো না?" সুরা যাখরুফঃ৩১।

('একজন গুরুত্বপূর্ণ মণীষী' এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আস সিয়ুতিঃ লুবানুন নুকুল ফি আসবাবিন নুজুল, তাফসিরুল জালালানসহ মুদ্রিত পৃষ্ঠা ২৮৯, ৬৪৯।)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক মনোনীত হয়েছিলেন জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নয় বরং তার বিরুদ্ধেই। মহানবীই ইসলামের সর্বোচ্চ কর্তাঃ তার নিজেতেই সঞ্চিত ছিলো আইন প্রণয়নকারী, পরিচালক, বিচারক, সরকার আর তিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিতও নন।

সুতরাং ইসলামের সরকার হচ্ছে এমন একটা সরকার যে জনগণেরও নয় কিংবা জনগণের দ্বারাও পরিচালিত নয়। জনগণ প্রণীত কোনো আইন এতে নেই; পরিচালক এবং বিচারক এক্ষেত্রে জনগণের জন্য জবাবদিহি মূলক নয়।

আবার দেখা যায় ঘটনাক্রমে এটা 'জনগণের জন্য' সরকারও নয়। ইসলামী পদ্ধতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহর জন্য।' সবকিছুই হতে হবে আল্লাহর জন্য'; যদি তা করা হয় জনগণের জন্য, তবে তাকে বলা চলে 'গোপন কর্তৃত্ববাদ'। হোক সে প্রার্থনা কিংবা সহৃদয়তা, সামাজিক বা পারিবারিক কর্মকান্ড, মাতা-পিতার আনুগত্য বা প্রতিবেশীর ভালোবাসা, প্রার্থনায় নেতৃত্ব প্রদান কিংবা মামলার রায় দেয়া, যুদ্ধে যাওয়া কিংবা ঘটনার সমাপ্তি টানা-তাকে অবশ্যই হতে হবে 'কুরবাতান ইল্লাল্লাহ্‌র সাথে, অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য পেতে আল্লাহকে খুশি করতে।

এবং আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি, শুধু আমার ইবাদতের জন্যে। সূরা যারিয়াতঃ৩৬।

ইহা খোদারই রাজ্য। এই রাজ্যের নেতৃত্বের ধারককে হতে হবে অবশ্যই খোদা কর্তৃক মনোনীত এবং ইহাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। পরবর্তী অধ্যায়ে, সঠিক ও সহজভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইহা তুলে ধরবো যাহা বিকৃতভাবে পালনীয় হয়ে আসছে।

দ্বিতীয় পর্ব

শীয়া দৃষ্টিকোণ

১. ইমামতের প্রয়োজনীয়তা এবং একজন ইমামের যোগ্যতা

ক. ইমামতের প্রয়োজনীয়তা

শীয়া দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যুক্তিসঙ্গতঃ কারণেই ইমামত নামের এই প্রতিষ্ঠানিকতার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহর লুৎফ (করুণা) মানবকে অবাধ্যতার কাছ থেকে সরিয়ে বাধ্যনুগত করে রাখে। কিন্তু বাধ্য করে না কোনভাবেই। শীয়া ধর্মতত্ত্বে এটা প্রমাণিত যে লুৎফ হলো আল্লাহার অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি করুণা। যদি আল্লাহ্ মানুষকে কিছু করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যদি তিনি জানেন মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব কিংবা আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া সে তা করতে পারবে না। আর তারপরও যদি আল্লাহ্ সহযোগিতা না করেন তবে কিন্তু তিনি নিজেই নিজের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করেছেন, সে কারণে লুৎফ হলো আল্লাহর অত্যাবশ্যক একটি দায়িত্ব।

ইমামতও হলো একটা লুৎফ, কেননা যখন মানুষের একজন প্রধান (রইস) এবং পথপ্রদর্শক (মুরশিদ) থাকে, যাদের তারা মেনে চলে যেন নির্যাতিত প্রতিকার পায় নির্যাতনকারীর হাত হতে এবং শাস্তি পায় নির্যাতনকারী; তবেই মানুষ ভুলপথ থেকে চলে আসে সত্য পথের কাছে।

এবং এটা একটা লুৎফ বা আল্লাহর অবশ্য করণীয় যে নবীর পরে উম্মাহকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন ইমামের নিয়োগ করা। *(আল্লামা আল হিল্লীঃ আল বাবুল হাদী আশার ইংরেজী অনু ডব্লিউ এম মিলার পৃষ্ঠা ৫০, ৬২-৪।)*

খ. শ্রেষ্ঠত্ব (আফযালিয়াৎ)

শীয়াদের বিশ্বাস নবীর মতো ইমাম ও উম্মত অপেক্ষা সর্বগুণে গুণান্বিত হবে, যেমন- জ্ঞান, সাহস, দয়া, বদ্যনতা এবং তাদের থাকবে ঐশী বিধিমালা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান। যদি তিনি তা না হন অর্থাৎ এই উচ্চ পদটি যদি বেশী গুণান্বিত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও কম গুণান্বিতের হাতে

চলে যায়, উত্তমের উপর যদি অধম অগ্রাধিকার পায় তবে, তা যুক্তিতেও টেকে না এবং যা ঐশী আইনের বিরোধী।

গ. ভ্রান্তিহীনতা (মাসুম)

দ্বিতীয় যোগ্যতা হলো 'ইসমাহ্' (অভ্রান্তি)। ইমাম যদি ভ্রান্তিবিহীন (মাসুম) না হন, তবে তিনি ভুলের শিকার হবেন এবং ভুলপথে পরিচালিত করবেন অন্যদের। *(পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪-৮১।)*

প্রথমতঃ আমাদের ভেতরে তাহলে তার কথা এবং নির্দেশের উপর পূর্ণ আস্থা থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ একজন ইমাম হলেন উম্মাহ'র শাসনকর্তা, প্রধান এবং তাকে উম্মা অকুণ্ঠচিত্তে প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে। এখন তিনি যদি কোন পাপ করে ফেলেন, তবে অনুসারীরা তাকে অনুসরণ করে সেই পাপ করবে তা বলাই বাহুল্য- এটা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা পাপের অনুসরণ খারাপ, অন্যায় এবং নিষেধ। তাহলে এটির অর্থ দাঁড়ায় যে, সে একই সঙ্গে অনুসরণযোগ্য এবং অ-অনুসরণযোগ্য হয়ে যাচ্ছেন; সুতরাং তার আনুগত্যের বাধ্যতামূলক কারণগতভাবে উদ্ভট।

তৃতীয়তঃ যদি একজন ইমামের পক্ষে ভুল করা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে একে বাধা দেয়াটা অন্য সবার দায়িত্ব হয়ে পড়ে (কারণ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরকে অন্যায় কাজে বারণ করা বাধ্যতামূলক)। সেক্ষেত্রে ইমাম হয়ে পড়বেন ঘৃণার্থ; তার সম্মান শেষ হয়ে যাবে এবং উম্মা নেতা হবার পরিবর্তে তিনি হচ্ছেন, তাদের দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত। সেখানে ইমাম হয়ে যাচ্ছেন উম্মার প্রায় অধিনস্থ।

চতুর্থতঃ ইমাম হলেন ঐশী আইনের রক্ষক সুতরাং ব্যর্থ হতে পারে এমন হাতে এ দায়িত্ব অর্পণ ঠিক নয় কিংবা এমন লোক ঠিক মত সে দায়িত্ব পালনও করতে পারবে না। ঠিক এই কারণেই অভ্রান্তি নবীত্বের অবিচ্ছেধ্য একটি অংশ; এই যে সব বিবেচনাগুলো যেগুলো নবীত্বের ক্ষেত্রে একে অপরিহার্য করে তুলেছে, একইভাবে তা ইমাম বা খলিফার ক্ষেত্রেও করবে।

এ বিষয়ে ১৩তম অধ্যায়ে আরো বলা হবে (উলেল আমরকে মাসুম হতেই হবে)।

ঘ. আল্লাহর তরফ হতে নিয়োগ

নবীদের মতোই কেবল উপরোক্ত গুণাবলী থাকলেই যে কোন একজন ইমাম হতে পারবেন না। ইমামত অর্জনের কোন বিষয় নয়, এটা আল্লাহর মনোনয়ন দেয়া একটি 'পদ'। {পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮।}

এ কারণেই শীয়া ইসনা আশারীরা (দ্বাদশজনীয়) বিশ্বাস করে যে কেবল আল্লাহই নবীর একজন উত্তরসূরীর মনোনয়ন দিতে পারে; এক্ষেত্রে উম্মাহর পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই, তাদের দায়িত্ব হলো ঐশী মনোনয়ন দেয়া ইমাম বা খলিফাকে অনুসরণ করা।

অপরপক্ষে সুন্নীরা বিশ্বাস করে যে খলিফার মনোনয়ন দান উম্মাহরই দায়িত্ব।

১. কোরআনের আয়াত

কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত শীয়াদের এই দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে।

এবং তোমার খোদা (সৃষ্টিকর্তা) যাহা চায় তাহাই সৃষ্টি করেন এবং যার প্রতি অনুগ্রহ থাকেন তাকে মনোনয়ন করে, ইহা জনগণের এখতিয়ারভূত নয় এবং যাহাকে তারা (এই লোকগুলো) খোদার শরিক করে খোদা ইহা থেকে পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে। (সুরা কাসাস ৬৮)।

এটাই স্পষ্ট করে দেখায় যে মানুষের নির্বাচনের কোন অধিকার নেই; সেটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে।

হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ফেরেশতাদের জানিয়েছিলেন যে-

সত্য সত্যই আমি জমিনে একজন খলিফা বানাতে যাচ্ছি॥ সূরা বাকারাঃ৩০।

আর ফেরেশতারা যখন এই পরিকল্পনায় নম্রভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন, এক তীব্র উত্তরে তাদের আপত্তি উবে গিয়েছিল- ***অবশ্যই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না*** (পূর্বোক্ত)। যদি মাসুম ফেরেশতাদেরই খলিফার মনোনয়নে বলার কিছু না থাকে তাহলে ভ্রান্তিযোগ্য মানুষ কি করে এমন মনোনয়নের পুরো দায়িত্ব নিজেদের উপর তুলে নেয়?

আল্লাহ নিজে হযরত দাউদ (আঃ) খলিফা করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন

হে দাউদ! অবশ্যই আমি তোমাকে পৃথিবীতে (আমার) খলিফা নিযুক্ত করিলাম। সুরা সোয়াদঃ ২৬।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ খলিফা বা ইমামের মনোনয়নের ক্ষেত্রে স্বয়ং নিজেই ভূমিকা রেখেছিলেন।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এঁর কাছে যে বাণী পৌছেছিল অনেকটা তার মতো আল্লাহ বলেছিলেন, ***অবশ্যই আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম নিযুক্ত করিলাম*** (ইব্রাহিম আঃ) বলিয়াছিলেন, ***এবং আমার সন্তানদের থেকেও*** আল্লাহ বলেছিলেন, ***আমার ওয়াদা (ইমামত) জালিমদের নিকটেই যাবে না।*** সূরা বাকারাঃ ১২৪।

এই আয়াতই ইমামত সম্পর্কে বহু প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের দেবে আল্লাহ বলিয়াছেন, ***অবশ্যই আমি তোমাকে মানব জাতীর ইমাম নিযুক্ত করলাম।***

ক. এটাই প্রমাণ করে যে ইমামত একটা ঐশী মনোনয়ন; এটা উম্মাহ (অনুসারীর) বৈধ কর্তৃত্বের বাহিরে।

খ. আল্লাহ্ বলেছিলেন, ***আমার ওয়াদা তোমার বংশের জালিমদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না।***

হযরত ইব্রাহিম আঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ***হে, খোদা আমার সন্তান থেকেও।***

এটা আরো স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, একজন ইমাম কখনোই মাসুম ব্যতীত হতে পারে না।

যুক্তিগতভাবে মানব সম্প্রদায়কে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি

১. যারা সারা জীবন অন্যায় করে চলে।

২. যারা কখনো অন্যায় করে না।

৩. যারা প্রথম জীবনে অন্যায় করেছে কিন্তু পরে ন্যায়ের পথে এসেছে।

৪. যারা প্রথম জীবনে ন্যায় করে, পরে অন্যায়ের পথে গিয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মান মর্যাদা উপরোক্ত চার শ্রেণী থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিল যে, তিনি প্রথম এবং চতুর্থ শ্রেণীর ইমামতের জন্যে খোদার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখন দু'টি শ্রেণী বাকী থেকে যায়। অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যারা এই প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আল্লাহ এদের মধ্যে থেকে এক শ্রেণীকে বাতিল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ সেই শ্রেণীকে যে প্রথম জীবনে জালিম ছিল কিন্তু পরে জুলুম থেকে তওবা করে ন্যায়ের পথে এসছে। তাহলে ইমামতের জন্য কেবল একটি দলই বাকী থাকে যারা সারাজীবন কখনো অন্যায় করেননি অর্থাৎ যারা মাসুম (নিষ্পাপ)।

গ. শেষ বাক্যটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় যে, "আমার অঙ্গীকার (ইমামত) জালিমের নিকটেই যাবে না।" এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আল্লাহ একথা কখনোই বলেননি যে, "জালিমরা আমার সেই অঙ্গীকার 'ইমামত ও খিলাফত' পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে ।" কেননা এর অর্থ এটাও হতে পারত যে এই মানুষ (যদিও সে ন্যায়পরায়ণ হোক না কেন) যেন, এটা কখনো বুঝে না ফেলে যে এটা ('ইমামত ও খিলাফত") তার আওতাধীন।

কিন্তু যে বাক্যটি আল্লাহ ব্যবহার করেছেন তা থেকে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। বরঞ্চ কথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায় ইমামতের পদবীটি আদম সন্তানদের আওতাধীন নয়, ইহা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর এবং তিনি যাকে পছন্দ করে তাকেই ইহা দান করেন। সাধারণ নিয়মের মতো করেই এটা বলা হয়েছে।

তাদেরকে মানব জাতির ইমাম নিযুক্ত করেছি আমার হুকুম থেকে তাদেরকে হেদায়াত করতে। সূরা আম্বীয়াঃ৭৩।

যখন হযরত মুসা (আঃ) একজন উজিরের (সহকারী) প্রয়োজন অনুভব করলেন যে উনার নবুয়্যতের কাজে সহযোগীতা করতে পারেন। তখন তিনি নিজের ইচ্ছায় কাউকে নিযুক্ত করেননি বরঞ্চ তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা করলেন।

......এবং আমার গোত্র থেকে আমার ভাই হারুনকে আমার সহযোগীতাকারী নিযুক্ত করে দাও। সূরা তাহা- ২৯-৩০।

হে মুসা! তোমার প্রার্থনাকে আমি কবুল করে নিলাম—পূর্বোক্ত ৩৬।

ঘ. এই জাতীয় মনোনয়ন উম্মতের কাছে নবী কিংবা ইমাম করে থাকেন এবং সেই ঘোষণাকে "নাস" (সিদ্ধান্ত, স্থিরকরণ) বলা হয় যার শাব্দিক অর্থ "তাওজী"। যা শীয়া বিশ্বাস অনুসারে একজন ইমামকে হতে হবে মিনসুস মিনাল্লাহ অর্থাৎ এই পদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত।

ঙ. অলৌকিক ক্ষমতাঃ

কারো ইমামত প্রাপ্তি সম্পর্কে কেউ যদি কোন নাস (ঘোষণা) শুনে না থাকে তবে সত্য নির্ধারণের একমাত্র পথ হলো অলৌকিক ক্ষমতার (মৌজেজা) মাধ্যমে- *পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯।*

সাধারণভাবে বলতে গেলে কোন ব্যক্তি যদি দাবী করে সে একজন ইমাম কিংবা নবীর খলিফা এবং অভ্রান্ত; সে ক্ষেত্রে অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র পরীক্ষা হলো অলৌকিক ক্ষমতা। যদি দাবীদার তার দাবীর পক্ষে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে পারে, তবে কোন দ্বিধা ছাড়াই তা মেনে নেয়া যেতে পারে। আর তা দেখাতে যদি সে ব্যর্থ হয় তবে বোঝা যাবে ইমামত বা খিলাফতের কোনো যোগ্যতা তার নেই, তার দাবী সেক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

২. পুর্ব দৃষ্টান্ত

নবীদের চিরস্থায়ী একটি কাজ হলো তাদের উত্তরসূরীর মনোনয়ন দেয়া (আলাহর নির্দেশে) কিন্তু উম্মাহ'র কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে।

নবীদের ইতিহাস খুঁজলে এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না যেখানে অনুসারীদের ভোটে উত্তরসূরী নির্বাচিত হয়েছে। এমন কোন কারণ নেই যাতে শেষ নবীর উত্তরসূরীর ক্ষেত্রে এসে এই ঐশী আইন পরিবর্তিত হবে। আল্লাহ বলেন,

তোমরা আমার আইনে কোন পরিবর্তন পাবে না। **সূরা এহযাবঃ৬২**

৩. যৌক্তিক কারণ

১. যে কারণে প্রমাণ হয় নবীর মনোনয়ন একটি ঐশী বিশেষাধিকার ঠিক সেই কারণ একইভাবে প্রমাণ করে যে, নবীর উত্তরসূরী মনোনয়নও ঘটবে ঠিক আল্লাহর তরফ থেকে। নবীর মতো, একজন ইমাম বা খলিফা মনোনীত হন আল্লাহর নির্দেশের কাজগুলো পালনের জন্য; সেক্ষেত্রে সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির জন্য বাধ্য। সে যদি জনগণের দ্বারা মনোনীত হয় তবে তার প্রথম আনুগত্য দেখাতে হবে আল্লাহ'র জন্য নয় বরং জনগণের জন্য যারা তাঁর 'কর্তৃপক্ষের ভিত্তি'। তাকে জনগণের মন জুগিয়ে চলতে হবে, কেননা যদি লোকেরা তার উপর বিশ্বাস একবার হারায় তাহলে তিনিও তাঁর পদ হারাবেন। সুতরাং সে ভয়ে কিংবা পক্ষপাতিত্বের কারণে ধর্মীয় দায়িত্ব ঠিকমত বন্টনও করতে পারবে না; রাজনৈতিক বিবেচনায় সারাক্ষণ পড়ে থাকবে তার চোখ, আর আল্লাহর নির্দেশের কাজগুলো হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

আর ইসলামের ইতিহাসের শুরুতেই এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষুদ্র প্রমাণ জ্বলজ্বল করছে। সুতরাং যুক্তিটি কেবল তত্ত্বীয়ই নয় এর পিছনে দৃঢ় ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে।

২. আবার, কেবল আল্লাহই মানুষের ভেতরের অনুভূতি ও মানুষের চিন্তাভাবনাকে জানতে পারেন; তিনি ব্যতীত কেউ কোনভাবে অন্য কারো ভেতরের সত্য চরিত্রকে কখনো জানতে পারে না। এমনও হতে পারে তার সহকর্মীদের কাছ থেকে সম্মান আদায় ও পার্থিব সুবিধা ভোগের জন্য অনেকে দেখাচ্ছে যে, সে খুব ধর্মপ্রাণ কিম্বা আল্লাহ ভক্ত। ইতিহাসে এসব নজির মোটেই বিরল নয়। উদাহরণ দৈয়া যাক, আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার সমস্ত সময় কাটাতো মসজিদে বসে, এবাদতে এবং কোরআন তেলাওয়াতে। কোরআন পাঠের সময় একদিন লোকেরা তার কাছে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এলো এবং তারা তার প্রতি আনুগত্য হবার অঙ্গীকার করলো। তখন সে কোরআন বন্ধ করে বললো, " এই (কোরআন) এখন থেকে আমার ও তোমার মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম"।– *(আস সিয়ুতিঃ তারিকুল খুলাফা, পৃষ্টা ২১৭।)*

সে কারণে কোনো ইমাম বা খলিফা হওয়ার যোগ্যতা কেবলমাত্র আল্লাহরই জানা থাকতে পারে এবং শুধুমাত্র আল্লাহই ইমাম বা খলিফার মনোনয়ন দিতে পারেন বা দেন।

৬. ইমামদের ভ্রান্তিহীনতা

এখন দেখা যাক পবিত্র মহানবীর আহলে বায়াত (পরিবারের সদস্য) বিষয়ে পবিত্র কোরআনে কি বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআন অনুসারে নবীর ইন্তেকালের সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছিলেন নিষ্পাপ ও কোন প্রকার ভ্রান্তিবিহীন। তারা হলেন ইমাম আলী (আঃ), মা ফাতেমা (আঃ), ইমাম হাসান (আঃ) ও ইমাম হোসেন (আঃ)। পবিত্রতার আয়াত (তাতহির) পড়া হয় এভাবে- ***হে (পয়গম্বরের) আহলে বায়াত! আল্লাহর ইচ্ছা যে আপনাদিগকে সকল প্রকার অপবিত্র থেকে দূরে রাখতে এবং ততোটুকু দূরে যতটুকু রাখার ক্ষমতা আছে।*** সূরা এহযাবঃ ৩৩।

সার্বজনীনভাবে এটা সত্যি যে উপরে উল্লিখিত চারজন ব্যক্তি হলেন 'পরিবারের লোক' এবং তারা নিষ্পাপ ও যে কোন প্রকার কলুষ মুক্ত।

এই আয়াতের আগের ও পরের পবিত্র মহানবীর স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, এবং সেখানে স্ত্রী লিঙ্গবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে ব্যবহৃত সর্বনাম হলো পুরুষ বাচক। এ আয়াত কেনই বা এখানে স্থাপন করা হয়েছে তার কারণ অনুমান কঠিন নয়। *(বিখ্যাত মণীষী আল্লামা পুয়া পাদটীকা নং ১৮৫৭ তে লিখে গেছেন (এস, বি, মীর আহমদ আলীর অনুবাদ)*

"আয়াতের এ অংশে পবিত্র আহলে বায়াত এর ঐশী পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত করে যে কথা বলা হয়েছে তাকে সঠিকভাবে পাদটীকা সহ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এ অংশটি পৃথকভাবে নাজিল হওয়া একটি আয়াত, কিন্তু যেহেতু নবীর স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাই স্থাপিত হয়েছে এখানে। এখানে স্থাপিত এই আয়াতটির সঠিক গবেষণায় তার গুরুত্ব ও এর পেছনের বিশেষ কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়-এখানেই স্ত্রী বাচক শব্দ বদলে পুরুষবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে। নবীর সঙ্গীনীদের কথা বলার সময় সর্বদা সর্বনাম গুলো ছিলো স্ত্রী বাচক। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের

একত্র করে যেখানে বলা হয়েছে সেখানে রয়েছে পুরুষ বাচক সর্বনাম। এই ক্ষেত্রে ভাষার ব্যকরণগত ব্যবহার এটিই স্পষ্ট করে তোলে যে এই বাকী অংশটি একেবারে আগের থেকে পৃথক এবং ভিন্ন কারণে ব্যবহৃত এবং এর সঠিক স্থাপনাও করা হয়েছে নবীর স্ত্রীদের প্রতিপক্ষে আহলে বায়াত এর সমকক্ষ অবস্থান দেখাতে। আমার ইবনে আবি সালমাহ যে নবীর কাছে পালিত হয়েছিল তাঁর বর্ণনায়–

এই আয়াত যখন নাজিল হয় তখন হযরত, উম্মে সালমার বাড়িতে অবস্থা করছিলেন। ***হে (পয়গম্বরের) আহলে বায়াত! আল্লাহর ইচ্ছা যে আপনাদিগকে সকল প্রকার অপবিত্র থেকে দূরে রাখতে এবং ততোটুকু দূরে যতটুকু রাখার ক্ষমতা আছে।*** সূরা এহযাব ঃ৩৩।

এই আয়াত নাজিল হলে হযরতের কন্যা মা ফাতিমা (আঃ) তার দুই ছেলে ইমাম হাসান (আঃ), ইমাম হোসেন (আঃ), মা ফাতিমার (আঃ) স্বামী এবং তার চাচাত ভাই ইমাম আলী (আঃ)কে এক করিয়ে নিজেকেসহ সবাইকে নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। আর আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন "হে আল্লাহ, এরাই আমার (আহলে বায়াত) বংশধর! যে কোনো ধরনের কলুষ থেকে তুমি ওদের দূরে রেখো, সঠিক পবিত্রতা দিয়ে সবাইকে পবিত্র করে নাও।" হযরতের সতী স্ত্রী উম্মে সালমা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নম্রভাবে নবীকে বলেন, 'হে খোদার পয়গম্বর" আমি কি এই দলে যোগ দিতে পারি' তার উত্তরে নবী বলেছিলেন, 'না, তোমার জায়গাতেই তুমি থাকো, তোমার জীবনও সততাপূর্ণ'। *(পবিত্র কোরআন ইংরেজী অনুবাদ এস ভি মীর আহমদ আলী পদটীকা ১৮৫৭, পৃষ্ঠা ১২৬১।)*

এই আয়াত বিষয়ে অসংখ্য তথ্যের অবতারণা করার স্থান নিশ্চয়ই এটা নয় তবুও আমি মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামানের নামে এই সুন্নী মণীষীর কথা উল্লেখ করতে চাই, যার অনুবাদ ও কোরআনের ব্যাখ্যা, আনওয়ারুল লুঘাত (কোরআন ও ঐতিহ্যের অভিধান)সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপঞ্জী হিসেবে গৃহীত। কোরআনের ব্যাখ্যায় এই আয়াত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'অনেকে হয়তো ভাববেন যাদের সাথে রক্ত সম্পর্ক আছে নবীর পরিবারের সেইসব সদস্যের কথাই কেবল উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসেন। বর্তমান অনুবাদক মনে করেন এটা সঠিক (সহী) এবং তা

নবীর সম্পর্ককে সঠিকভাবে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। কারণ, নবী নিজেই তার পরিবারের সদস্য বলতে এ ক'জনেরই ঘোষণা দিয়েছেন। সে কারণে এটিকে গ্রহণ এবং বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলকই। আরো একটা প্রমাণ এই যে এর আগের এবং পরের আয়াতে ব্যবহৃত সর্বনামগুলো স্ত্রী বাচক আর এটি পুরুষ বাচক....."।– *(ওয়াহিদুজ্জামানঃ তাফসীর ওয়াহিদি (একই লেখকের অনূদিত কুরআনের মার্জিনে) অনুচ্ছেদ ২২ পাদটীকা, ৭ পৃষ্ঠা ৫৪৯–৫০।*

আনওয়ারুল লুঘাত–তে তিনি বলেছেন, 'সঠিক দৃষ্টিকোণ হলো যে পবিত্রতার এই আয়াত কেবল পাঁচ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে [অর্থাৎ হযরত নিজে, ইমাম আলী (আঃ), মা ফাতেমা (আঃ), ইমাম হাসান (আঃ) ও ইমাম হোসেন (আঃ)] যদিও আরবী ভাষায় আহলে বায়াত শব্দটি স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেকে এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন এই পাঁচজন লোক পাপমুক্ত এবং মাসুম (ভ্রান্তিবিহীন)। কিন্তু মাসুম যদি নাও হন। তবে নিশ্চিতভাবেই মাহফুজ (যে কোন ধরনের ভুল ও পাপ থেকে সুরক্ষিত)।"– *(ওয়াহিদুজ্জামানঃ আনওয়ারুল লুগাত অনুচ্ছেদ ২২, পৃষ্ঠা ৫১।)*

আমি এই দুটো তথ্য উদ্ধৃত করলাম এ কারণে যে কেবলমাত্র ইসনা আশারীরাই নয় বরং অনেক সুন্নী মণীষী ও এটা স্থির করেছেন যে আরবী ব্যাকরণ এবং হযরতের অখন্ড সঠিক ঐতিহ্য অনুসারে কেবল ইমাম আলী (আঃ), মা ফাতিমা (আঃ), ইমাম হাসান (আঃ) এবং ইমাম হোসেন (আঃ) এই আয়াতে অন্তর্ভুক্ত পাশাপাশি নবী স্বয়ং তো বটেই। আর এই ব্যক্তিরা যে নিষ্পাপ, সে মত সুন্নী মণীষীরাও পোষণ করেন। আপাতঃভাবে তারা বলেন যে, তারা ভ্রান্তি বিহীন না হলেও (তাত্ত্বিকভাবে) অন্ততঃ সকল পাপ ও ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত (বাস্তবভাবে)।

আহলে বায়াত এর পবিত্রতা (ইসমাহ্) পরীক্ষা করার আরো অনেক আয়াতও ব্যাখার ঐতিহ্য রয়েছে, কিন্তু স্থানাভাবে সবগুলো গ্রন্থবদ্ধ করা সম্ভব হলো না।

৭. ইমাম আলীর (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব (আফজালিয়াত)

'আফজালিয়াত' (শ্রেষ্ঠত্ব) বলতে ইসলামে নবী কিম্বা ইমাম তার অনুসারীদের চেয়ে সব বিষয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন।

সকল মুসলমানই এ বিষয়ে একমত যে আমরা যে ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝি এটা ঠিক সেভাবে নয় বরং কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতেই। বিখ্যাত সুন্নী মণীষী আল–গাজ্জালী লিখে গেছেন যে, "শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা কেবল

আল্লাহ এবং নবী ছাড়া কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।- *(ইমাম গাজ্জালীঃ এহিয়া উলুমিদ্দীন, খন্ড ১, অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ১০।)*

আমাদের সুন্নী ভাইয়েরা বিশ্বাস করেন যে, শ্রেষ্ঠত্ব আসলে খলিফার ক্রমানুসারে অর্থাৎ আবুবকর শ্রেষ্ঠতম, তারপর ওমর, ওসমান ও শেষে আলী। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো প্রমাণ নেই। আবার বর্তমান দিনে সকল সুন্নীরাও এই মত পোষণ করেন না। হযরতের সময়, আমরা খুঁজে পাই তার বহু সম্মানিত সাহাবী যেমন সালমান আল ফারসী, আবু জর আল গিফারী, মেকদাদ আল কান্দি, আমর ইবনে ইয়াসির, খাব্বাব ইবনে আল আরাত, জাবির ইবনে আবদিল্লাহ আনসারী, হুদজাইফাহ ইবনে আল ইয়ামানী, আবু সাঈদ আল খুদরী, জায়ীদ ইবনে আরকাম এবং আরো অনেকে বিশ্বাস করেন ইমাম আলী (আঃ) ছিলেন আহলে বায়াত এবং সাহাবীদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠতম।- *(ইবনে আবদিল বারঃ আল ইশতিয়াব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৭০।)*

আহমাদ ইবনে হামবালকে একবার তার পুত্র শ্রেষ্ঠতার ক্রম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন আবু বকর, ওমর এবং ওসমান। পুত্র জিজ্ঞাসা করেছিল 'আলী ইবনে আবু তালিব নেই কেন?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'তিনি তো আহলে বায়াত এর ভেতর, তার সাথে অন্যাদের সাথে তুলনাই হতে পারে না।- আল কান্দুজিঃ *(ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, পৃষ্ঠা ২৫৩।)*

ওবায়দুল্লাহ আমৃতসরী তার বিখ্যাততম বই আরজাহুল মাতালিব গ্রন্থে লিখেছেন 'শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ যদি অধিক সাওয়াব অর্জন হয় তবে, কেবল নবীর হাদীস (ঐতিহ্য) থেকে এর প্রমাণ পাওয়া সম্ভব... যদি সেখানে পরস্পর বিরোধী ঐতিহ্য পাওয়া যায় তবে নির্ভরযোগ্যটিকেই গ্রহণ করা উচিত, দুর্বল ঐতিহ্যের ভিতর থেকে সত্য ঐতিহ্য চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আল আল্লামা ইবনে আবদীল বার তার আল ইসতিয়াব-*(ইবনে আবদীল বারঃ আল ইশতিয়ার, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১১১৫।)*

নাম আল হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থে আমিরুল মোমেনিন আলীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে লিখে গেছেন যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হামবাল, আল কান্দী ইসমাইল ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ ইবনে আলী ইবনে শোয়েব আল নাসায়ী এবং আল হাফিজ আবু আল নাসাবুরী- *(ইবনে হাজার আল হাতামীঃ সাওয়াকে মুহরিকা, পৃষ্ঠা-৭২, ইবনে হাজার আল আশকালানীঃ ফাতহুল বারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৭১)*। বলেছেন যে, বহু বর্ণনাকারীর কাছ থেকে ভালো গুণ বিষয়ে

বহু হাদীস এসেছে কিন্তু কোন সাহাবী আলী ইবনে আবু তালীব (আঃ) এর ভালো গুণগুলোর মতো নয়।?

"তদুপরি যদি আমরা পৃথকভাবে আমিরুল মোমেনিন ইমাম আলী (আঃ)–এর বিশেষ গুণগুলোর দিকে তাকাই যেগুলোর কারণে তিনি আল্লাহর কাছে আরো প্রশংসার দাবীদার, তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে মহানবীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি হলেন তিনি।–*(অমৃতসরী, আরজাহুল মাতালিব পৃষ্ঠা ১১২।)*

লেখক নিজে একজন সুন্নী এবং তিনি উপরোক্ত গ্রন্থে ৩য় অধ্যায়ে ১০৩–১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে আমি এখানে ইমাম আলী (আঃ)–এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত আয়াত এবং ঐতিহ্যের ছোট তালিকাও উপস্থাপন করতে পারছি না। তবু এতটুকু বলা যায়, পবিত্র কোরআনে আলী ইবনে আবু তারিব (আঃ)–এর গুণ বর্ণনা করে ৮৬টি আয়াত রয়েছে এবং এ বিষয়ে কত তফসীর রয়েছে তা বলা অসম্ভব।

এভাবে এটা এমনকি যে কেউ সামান্য পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে মহানবীর পর ইমাম আলী (আঃ)ই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি।

৮. ইমাম আলী (আঃ) এর মনোনয়ন

ইমাম আলী ইবনে আবু তালিব এর একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবার পর যে প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে তা হলো আল্লাহর তরফ থেকে ইমাম আলী (আঃ)র নিয়োগ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহানবী ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আলী (আঃ) হবেন তার উত্তরসূরী এবং খলিফা।

সত্যিকার ঘটনা হলো যেদিন নবী (সাঃ) তার প্রথম নবুয়ওত ও রিসালতের ঘোষণা দেন, সেই দিন তিনি ইমাম আলী (আঃ)–এর খেলাফতের ঘোষণাও করে দেন; যখন আল্লাহর কাছ থেকে এই আদেশ আসে– ***হে রাসুল! আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দের ভয় দেখান।*** সূরা শুরা– ।শুয়ারা, ২১৪

তখন হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ইমাম আলী (আঃ)কে খাবারের বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়ে আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের দাওয়াত দেবার হুকুম দিলেন, যেন আল্লাহর বাণী তিনি তাদের কাছে পৌছে দিতে

পারেন। ভোজের পর মহানবী কথা বলা শুরু করতেই আবু লাহাব নাক গলিয়ে বলে উঠলো- তোমাদের সঙ্গী তোমাদের উপর যাদু করে দিয়েছে। একথা শুনে তাদের সকলে চলে গেল।

পরদিন আল্লাহর নবী আবার ভোজের দাওয়াত দিলেন। খাওয়া শেষ হলে নবী তাদের সম্বোধন করে কিছু বলতে চাইতেই, আবু লাহাব ও তার সঙ্গীরা অন্য দিনের মতো উঠে যেতে চাইল। তখন হযরত আবু তালেব, আবু লাহাবকে বাধা দিয়ে বললেন, "এটা কিরূপ ভদ্রতা যে, শুধু খাবে আর চলে যাবে। মুহাম্মদ কি বলতে চাচ্ছে সেটি শুনে যাও। তোমরা তা মানো বা না মানো। তখন নবী বললেন, "হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্রগণ! আমি আপনাদের ডেকেছি ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য। কারণ খোদা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনাদের এ পথে আহবান জানাতে। আপনাদের ভেতর কে আছে যে, আমার এই কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। তিনি আমার ভাই, আমার উত্তরসূরী এবং খলিফা হবেন"। মহানবী এই কথা তিনবার উচ্চারণ করিলেন। ইমাম আলী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনাকে সাহায্য করবো, আমি আপনার সহযোগিতা করবো- একমাত্র আলী ছাড়া কেউই এর উত্তর দিলেন না। উপস্থিত সকলের মধ্যে আলীই ছিলেন সবার ছোট। তারপর নবী আলীর ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, "হে আমার আত্মীয়রা এই আলী আমার ভাই? উত্তরসূরী এবং খলিফা। তার কথা শুনবেন এবং মানবেন।" – *(ইবনুল আসিরঃ আল কামিল, [খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬২-৩]; আল বাঘাঈঃ [খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৭]; আল খাজিনঃ আত তাফসীর [খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৭]; আল রাহাকীঃ দালাইলুন নবুয়াহ [খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২৮-৩০]; আস সিয়ুতিঃ দুর্রে মানসুরঃ [খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৭]; আল মুত্তাকী আল হিন্দীঃ কানজুল আম্মাল [খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১০০, ১১৩, ১১৫-১৭]; আল ফিদ আল মুখতাসার [খন্ড-১, পৃষ্ঠা ১১৬-৭]; আত তাবারিঃ আত তারিখ [খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭১-৭৩] কার্লাইল, টিঃ On Heroes, Hero worship and The Heroic in History, পৃষ্ঠা ৫৪]; গিবন, ইঃ The decline and Fall of the Roman Empire, [খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৪]; ড্যাভেনপোর্ট, J: An Apology for Muhammed and the Koran, [পৃষ্ঠা ২১]; আরভিং ডব্লিউঃ Mahommed and his Successors, [পৃষ্ঠা ৪৫] আরো তথ্যের জন্য আল আমিনিঃ আল গাদির, খন্ড ২, পৃষ্ঠা২৭৮-৮৯।)*

এটা উল্লেখ করার মতো যে, আত তাবারী লিখিত আত তারিক এর Leiden সংস্করণে (১৮৭৯ খ্রী, পৃষ্ঠা ১১৭৩) মহানবীর কথাগুলো

লিপিবদ্ধ করা আছে ওয়াসিহি ওয়া খলিফাতি (আমার উত্তরসূরী আমার খলিফা) হিসেবে; কিন্তু কায়রো সংস্করণে এই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বদলে লেখা হয়েছে কাদহা ওয়া কাদহা (যেমন তেমন)! দেখুন এই প্রাতিষ্ঠানিক পৃথিবী কিভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সততা ও নিষ্ঠার পরিবর্তন করে থাকে।

৯. প্রভুত্বের আয়াত

এর পর বহু উৎসবে বহু আয়াত এবং ঐতিহ্য মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, মহানবীর পর ইমাম আলী (আঃ) হলেন সবার প্রভু। এমন একটি মূল্যবান আয়াত হলো নিম্নোক্তটি-

অবশ্যই আল্লাহ তোমার প্রভু, তাঁর রাসূল তোমার প্রভু এবং যারা ঈমান এনেছে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দান করেন রুকুকালীন অবস্থায়। (সূরা মায়দাঃ ৫৫

মুসলিম মণীষী শীয়া বা সুন্নী সকলে ঐক্যমত যে, এই আয়াত নাজিল হয়েছিল ইমাম আলী (আঃ)কে কেন্দ্র করেই। এটা খুব স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে যে বিশ্ববাসীদের তিন প্রভু প্রথমতঃ আল্লাহ, দ্বিতীয়তঃ তার নবী এবং তৃতীয়তঃ ইমাম আলী (আঃ) (সাথে পরবর্তী এগারো জন ইমাম)।

হযরত আবু জার থেকে বর্ণিত যে, একদিন আমি নবীর সঙ্গে মসজিদে নামাজরত ছিলাম। তখন একজন ভিখারী মসজিদে এসে ভিক্ষা চাইতে লাগিল। যখন কেহই তাকে কিছু দেয়নি তখন সে আকাশের দিকে দু'হাত উঁচু করে বলতে লাগল- "হে খোদা! তুমি সাক্ষী থেকো আমি বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম। মসজিদে নববী থেকে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি। ইমাম আলী (আঃ) সে সময় রুকুতে ছিলেন। তিনি তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলে পরানো আংটিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সে তা নিয়ে চলে গেল।

এই ঘটনা নবীর সম্মুখেই ঘটেছিল। নবী (সাঃ) দু'হাত আকাশের দিকে উঁচু করে দোয়া করতে লাগলেন- "হে খোদা! আমার ভাই মুসা তোমার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দাও, আমার কর্মকে সহজ করে দাও, আমার জিহ্বার জড়তা খুলে দাও যাতে

জনগণ আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবার হতে আমার ভাই হারুনকে আমার উজির (সহকারী) বানিয়ে দাও এবং হারুন দ্বারা আমার পাঁজরকে শক্তিশালী করে দাও এবং হারুনকে আমার কাজের সঙ্গী করে দাও"।

হে খোদা! তুমি মুসাকে বলেছিলে আমি তোমার হাতকে হারুন-এর দ্বারা শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদের দু'জনের মধ্য থেকে একজনের নিকট কেহ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে পারবে না। হে খোদা! আমিই মুহাম্মদ তুমি আমাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছো। তুমি আমারও অন্তরকে প্রশস্ত করে দাও। আমার কর্মকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পরিবার হতে আমার ভাই আলীকে আমার উজির (সহকারী) করে দাও এবং তাহার দ্বারা আমার পাঁজরকে শক্তিশালী করে দাও। প্রার্থনা শেষ হতে না হতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার জন্য উপরোক্ত আয়াতটি বয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

হাদীসের উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্র এটা নয়। (হাদীসের সংখ্যা শতাধিক) এই আয়াত একক ও পৃথকভাবে দেখিয়ে দেয় যে, ইমাম আলী (আঃ)কে মহনাবীর পর মুসলমানদের প্রভু হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল।

১০. গাদির খুম এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

এই সব পুর্বোক্ত ঘোষণাগুলোকে আমরা গাদির খুমের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পূর্ব প্রস্তুতি বলতে পারি।

এই ঘটনাটি শীয়া-সুন্নী দু'টি গোত্রের শিক্ষিত, জ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও মণীষীদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র মহানবীর উত্তরসূরী হিসেবে ঘোষণা দেয়ার জন্য কি বিশাল আনুষ্ঠানিকতা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা এখানে পাবো।

গাদির খুম মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী জুফায় অবস্থিত। শেষ হজ্ব সেরে মদীনা যাত্রার সময় হযরত যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহর জরুরী নির্দেশ জানিয়ে যায়-

হে রাসূল! পৌঁছিয়ে দিন (বাণী) যাহা আপনার রব হইতে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর যদি ইহা পৌঁছিয়ে না দেন তাহা হইলে

মনে করা হইবে যে, আপনি রেসালাতের কোন কাজই সমাধা করেন নাই এবং আল্লাহ আপনাকে মানুষের (দুষ্টদের) নিকট হইতে রক্ষা করিবেন।– (সূরা মায়েদাঃ ৬৭)

নবী সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়েন যারা সামনে চলে গিয়েছিল তাদের পিছনে ফিরতে বললেন, আর পিছনের লোকদের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পুরো কাফেলা যখন একত্রিত হলো তখন উটের গদিগুলো দিয়ে মঞ্চ বানিয়ে ফেলা হলো আকাশিয়া কাঁটা গাছ পরিষ্কার করে। নবী সেই মঞ্চে উঠে দীর্ঘ শ্লোক পাঠ করলেন। দিনটা ছিলো প্রচন্ড গরম। ফলে পায়ের নীচে ও মাথার উপরে পরিধেয় বস্ত্রের অংশ দিয়ে রাখতে হলো সবাইকে। মহানবী এই বলে সবাইকে সম্বোধন করেলনঃ

"হে লোকেরা শোনো! তোমরা তো জানো জিব্রাইল পরম করুণাময় খোদার হুকুম নিয়ে বহুবার আমার কাছে এসেছে, সে কারণে আমি এখানে থামলাম কথাটা তোমাদের কালো ও সাদা প্রত্যেককে জানাতে যে, আবু তালিবের পুত্র আলী আমার ভাই এবং ওয়াসি (উত্তরসূরী) এবং আমার খলিফা এবং আমার পরবর্তী ইমাম। মুসার কাছে হারুনের স্থান যেমন ছিলো আমার কাছে তার স্থান তেমন, পার্থক্য কেবল এই আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। আল্লাহ ও তার নবীর পরেই সে তোমাদের প্রভু।

শোনো লোকেরা! আল্লাহ খুব আগ্রহের সাথে তাকে তোমাদের ইমাম এবং খলিফা মনোনীত করেছেন। তার প্রতি সকলেই আনুগত দেখাবে একইভাবে মুহাজির (বহিরাগত) আনসার (সাহায্যকারী) এবং যারা তাদের পথে আছো, শহরবাসী, যাযাবর, আরব, অনারব, মুক্ত মানুষ ও ক্রীতদাস, বুড়ো ও জোয়ান, বড় ও ছোট, সাদা এবং কালো; প্রত্যেকেই মানতে হবে তার কথা, যারা এক আল্লায় বিশ্বাস রাখে। যে তার বিরোধিতা করে সে অভিশপ্ত হোক আর, যে তাকে অনুসরণ করে সে হোক আর্শীবাদপুষ্ট আর যে তাকে বিশ্বাস করবে সে হবে সত্যিকার বিশ্বাসী।

শোনো লোকেরা! এই শেষবারের মতো তোমাদের সমাবেশে আমি দাঁড়াচ্ছি। তাই তোমরা খোদার কথা শোনো, পালন করো এবং তার

কাছে আত্মসমর্পণ করো। আল্লাহ্ তোমাদের প্রভু, তার পর তোমাদের নবী মোহাম্মদ যে তোমাদের কাছে এ কথাগুলো বলছে সেও তোমাদের প্রভু; আর আমার পরে আলী হবে তোমাদের প্রভু ও ইমাম, আল্লাহ্রও এটাই ইচ্ছা। তাঁর পরে তার মাধ্যমে আমার বংশধররা ইমামত পেতে থাকবে যতদিন না তোমরা আল্লাহ্ ও তোমার নবীর সম্মুখীন (হাউজে কাওসার) হচ্ছো।

শোনো লোকেরা! মন দিয়ে কোরআন পড় এবং এর অর্থ বোঝ; স্পষ্ট আয়াত মত কাজ করো, অস্পষ্টগুলোর কাছে যেয়ো না। কেননা আল্লাহ্র নির্দেশে কেবল এই ব্যক্তি (অর্থাৎ আলী) ছাড়া আর কেউ তোমাদের কাছে এর সঠিক অর্থ ব্যাখ্যা করে হুঁশিয়ারী জানাতে পারবে না। সেই আলীর হাত আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এবং তোমাদের সামনেই বলছি, আমি যাদের যাদের প্রভু এই আলীও তাদের তাদের প্রভু। সে আবু তালিবের পুত্র আলী, আমার ভাই এবং উত্তরসূরী; সর্বোচ্চ ক্ষমতাময় ও পরম প্রশংসিত আল্লাহ্ তার প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।"

এই বক্তৃতায় সংক্ষেপে অন্য ইমামদের কথাও বলা হয়েছিল; বিভিন্ন ঐতিহ্যে তাদের পুংখানুপুংখ বিবরণও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, এক অনুষ্ঠানে ইমাম হোসেনকে সম্বোধন করে নবী বলেছিলেনঃ 'তুমি একজন ইমাম এবং একজন ইমামের পুত্র, একজন ইমামের ভাই ও তোমার নয় জন বংশধর ধর্মপ্রাণ ইমাম হবে এবং তাদের নবতম জন হবে কাইম (যে জেগে উঠবে)।– *(আল কান্দুজিঃ নায়াবুউল মাওয়াদ্দাহ [পৃষ্ঠা ১৬৮, আমৃতসরীঃ আরজাহুল মাতালিব, পৃষ্ঠা ৪৪৯।)*

যে কোন সামান্য দৃষ্টিপাতকারী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, ঐশী আদেশেই মহানবী এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে মহানবী এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিলেন।

প্রথমেই তিনি শ্রোতাদের জানিয়ে দিলেন যে, ঘোষণার শেষাংশে তিনি পৌঁছে গেছেন আর তিনি যে বিশ্বস্তভাবে তার উপর অর্পিত

দায়িত্বভার যথাস্থানে দিয়ে যাচ্ছেন, তার সাক্ষী রইল এই উপস্থিত লোকবৃন্দ। তরপর তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, "তোমাদের নিজেদের চেয়ে আমি কি গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ নই?" তখন সকলে সমস্বরে চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের নিজেদের উপর নিজেদের যে অধিকার আছে, তার চেয়েও তাঁর অধিকার বড়। তখন নবী বললেন, 'আমি যাদের যাদের প্রভু এই আলীও তাদের তাদের প্রভু"। শেষে তিনি আলীকে এই বলে আর্শীবাদ করলেন যে, "হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসবে তুমিও তাদের ভালোবেসো, যে আলীর শত্রু হবে তুমিও তার শত্রু হয়ো, যে তাকে সাহায্য করবে তাকে তুমি সাহায্য করো, যে আলীকে পরিত্যাগ করবে তুমিও তাকে পরিত্যাগ করো।"

অনুষ্ঠান শেষ হলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হলো–

আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে, সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের .... নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের জন্যে মনোনয়ন করলাম।(সূরা মায়দাঃ৩)

এই ঐশী যোগাযোগ স্পষ্ট করে এটাই দেখায় যে, ইমাম আলী (আঃ)এর এই মনোনয়ন দানের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁর সন্তুষ্টিচিত্তে ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণ আকারে অনুমোদন দিলেন। বেহেশ্ত থেকে আসা এই আনন্দের জোয়ারে ভেসে বিশ্বাসীরা ইমাম আলী (আঃ)কে স্বাগত জানালেন নবীর সামনেই। আর বহু কবি এই উপলক্ষ্যে রচনা কররেন বহু পংক্তি। এসব সত্য ঘটনাগুলো বিভিন্ন ঐতিহ্যর বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলোকে পাঠক পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পাবেন।

১. গাদিরের হাদীস বিশুদ্ধ

বিভিন্ন সুন্নী মুসলিমদের গ্রন্থ থেকে নেয়া হযরতের দেয়া বক্তৃতা (খুতবা) নিম্নোক্ত অংশগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণঃ

আমি তোমাদের জন্য তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি দু'টি মূল্যবান বস্তু (১) আল্লাহ্র কিতাব (. কোরআন) এবং (২) আমার ইতরাত (আহলে বায়াত) আমার পরিবারের সদস্য। তারা হাওজে কাওসারে (বেহেশতী একটি দিঘী) আমার সাথে পুনরায় দেখা না হওয়া পর্যন্ত, একে অপর

থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।অবশ্যই আল্লাহ আমার প্রভু আর আমি বিশ্বাসীদের প্রভু। তারপর তিনি আলীর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেনঃ "আমি যাদের যাদের প্রভু, এই আলীও তাদের তাদের প্রভু"।

এই দুটি ঐতিহ্য কে বর্ণনা করা 'দুটি মূল্যবান বস্তু' (সাকালায়েন) এবং প্রভুত্ব (বিলায়েত) এর ঐতিহ্যবলে। শত শত ঐতিহ্য বর্ণনাকারী এই দুটি ঘটনাকে পৃথক পৃথক ওভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভুপালের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার বর্ণনায় "আলি হাকীম আবু সাঈদ বলেন যে, 'দুটি মুল্যবান বস্তু" এবং 'আমি যাদের যাদের প্রভু এই আলী তাদের তাদের প্রভু' হলো বিশুদ্ধ (অর্থাৎ যেন এতে কোন সংশয় না জাগে) এদের সংখ্যা এত বেশী যে মুহম্মদ ইবনে জারী এই ঐতিহ্যদুটিকে পঁচাত্তর জন বর্ণনাকারী (আসনাদ) কাছ থেকে শুনে লিখে গেছেন। তিনি কিতাবুল বিলায়েত নামে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন এবং আল হাফিজ আদ দাহাবী ও এর বর্ণনাকারী এর উপর ভিত্তি করে একটি গ্রন্থ লিখেছেন, যেটি একে বিশুদ্ধ বলে সত্য প্রমাণ করে। আর আবুল আব্বাস ইবনে উকদাহ গাদির খুমের এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে একশ পঞ্চাশ জন বর্ণনাকারীর বর্ণনাসহ একটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন"।– *(সিদ্দিক হাসান ঃ মানহাজুল ওয়ুসুল, পৃষ্ঠা ১৩।)*

কিছু কিছু লেখক গাদিরে খুম এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এটা বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই হাদীস বিশুদ্ধ এবং মরহুম মণীষী আল আল্লামা আল আমিনি তার বিখ্যাত আল–গাদির নামের বইটিতে (পূর্ণ তথ্যসহ) এই হাদীস বর্ণনাকারী মহানবীর ১১০ জন সাহাবীর বর্ণনা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ আমি আলিফ অক্ষরের নামের একটি তালিকা দিচ্ছি। (ব্রাকেটে সংখ্যাগুলো তাদের মৃত্যুর হিজরী সন নির্দেশ করে।

১. আবু লায়লা আল আনসারী (৩৭); ২. আবু জায়নাব ইবনে আওয়াফ আল আনসারী (–); ৩. আবু ফাদালাহ আল আনসারী (৩৮); ৪. আবু কুদামাহ্ আল আনসারী; ৫. আবু আমরাহ ইবনে আমর ইবনে মুহাসিন আল আনসারী; ৬. আবুল হাতেম ইবনে আল তাইয়ান (৩৭); ৭. আবু রাফি আল কিবতী, পবিত্র মহান বীর ক্রীতদাস ছিলেন; ৮. আবু

ধাইয়্যাব খুআলিদ (বা খালিদ) ইবনে খালিদ আল হুদাহালি; ৯. উসামাহ ইবনে জায়েদ ইবনে হারিযাহ; (৫৪); ১০. উবাই ইবনে কাব আল আনসারী (৩০ বা ৩২); ১১. আসাদ ইবনে জুরারাহ আল আনসারী; ১২. আসমা বিনতে উমাইস; ১৩. উম্মে সালমাহ, মহানবীর স্ত্রী; ১৪. উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব; ১৫. আবু হামজা আনাস ইবনে মালিক আল আনসারী ১৬. আবু বকর ইবনে আবি কুহাফাহ এবং ১৭ আবু হোরায়রাহ।
– (আল আমিনীঃ আল গাদির, খন্ড–১, পৃষ্ঠা ১৪–১৮।

এবং উপরোক্ত সাহাবীদের কাছে এই হাদীস শুনে পুনরায় বর্ণনা করেছেন এমন তাবেঈন (সাহাবীদের শিষ্য)–এর সংখ্যা ৮৪ জনের কম হবে না। এক্ষেত্রেও আলিফ অক্ষরের উদাহরণটি দেয়া হলো।

১. আবু রশিদ আল হুবরানী আস শামী; ২. আবু সালমাহ ইবনে আবদির রাহমান ইবনে আওফ; ৩. আবু সুলাইমান আল মুয়াজ্জিন; ৪. আবু সালিহ আস শামান, দাকওয়ান আল মাদানী; ৫. আবু উনফুয়ানা আল মাজিনি; ৬. আবু আবদির রহিম আল কিন্দি; ৭. আবুল কাসিম, আশাবাগ ইবনে নুবাতাহ আত্–তামীমী; ৮. আবু লায়লী আল–কিন্দি; ৯ ইয়াস ইবনে নুধাইর।– *(পূর্বোক্তঃ পৃষ্ঠা ৬২–৬৩।)*

ঐতিহ্য সংরক্ষকরা এই হাদীসকে প্রতিটি শতকের প্রতিটি যুগের বর্ণনাক্রমে তাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এই হাদীস হিজরী দ্বিতীয় শতকে যেসব মণীষী ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ বর্ণনা করেছেন তারা হলেনঃ

১. আবু মুহাম্মদ, আমর ইবনে দিনার আল জুমাহী আল মাক্কী (১১৫ বা ১১৬); ২. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ আল কুরাইশি আজ–জুহরী (১২৪); ৩. আবদুর রাহমান ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আত–তায়েমী আল মাদানী (১২৬); ৪. বকর ইবনে সোয়াদাহ ইবনে থুমামা, আবু থুমামা আল বসরী (১২৮); ৫. আবদল্লাহ ইবনে আবি নাজিহ, ইয়াসীর আথ–থাকিফি, আবু ইয়াসার আল মাক্কী (১৩১); ৬. আল হাফিজ মাঘিবাহ ইবনে মুকাসিম, আবু হিশাম আজ দাব্বী আল কুফী (১৩৩); ৭. আবু আবদির রাহিম খালিদ ইবনে জায়েদ আল জুমাহি আর মিশরী (১৩৯); ৮. হাসান ইবনে আর হাকাম আল নাখায়ি আল কুফী (১৪০); ৯. ইদ্রিস ইবনে ইয়াজিদ, আবু আবদুল্লাহ

আল আওয়াদি আল কুফী; ১০. ইয়ায়া ইবনে সাঈদ ইবনে সাঈদ ইবনে হায়ান আত তায়েমী আল কুফী; ১১. আল হাফিজ আবদুল মালিক ইবনে আবি সুলায়মান আল আর জামী আল কুফী (১৪৫); ১২. আওয়াফ ইবনে আবি জামিলাহ্ আল-আবদি আল হাজারি আল বাসরি (১৪৬); ১৩. উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমার ইবনে হাফস ইবনে আসিম ইবনে উমর ইবনে আল খাত্তাব আল আদায়ী আল-মাদানী (১৪৭); ১৪-নুয়াম ইবনে আল-হাকিম আল মাদানী (১৪৮); ১৫. তালহা ইবনে ইয়ায়া ইবনে তালহা ইবনে উবয়দুল্লাহ আততায়েমী আল কুফী (১৪৮); ১৬. আবু মুহাম্মদ কাসির ইবনে জায়েদ আল আসলামী (১৫০); ১৭. আল হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে ইশাক আল মাদানী (১৫১ বা ১৫২); ১৮. আল হফিজ মুয়াম্মার ইবনে রশিদ, আবু উরওয়াহ্ আল আজদি আল বশরী (১৫৩ বা ১৫৪); ১৯. আল হাফিজ মিশার ইবনে খিদাম ইবনে জহির আল হিলালী আর রাওয়াসি আল কুফী (১৫৩ বা ১৫৪) ২০. আবু ইসা হাকাম ইবনে আবান আল আদানি (১৫৪-১৫৫); ২১. আবদুল্লাহ্ ইবনে শওদাব আল বালখী আল বসরী (১৫৭); ২২. আল হাফিজ শুবাহ্ ইবনে আল হাজ্জাজ, আবু বিস্তাম আল ওয়াসিতি (১৬০); ২৩. আল হাফিজ আবুল আলা, কামিল ইবনে অলী আলা আত--তামিমি আল কুফী (১৬০); ২৪. আল হাফিজ সুফিয়ান ইবনে সাইদ আথ-থাওয়ারী, আবু আবদিল্লাহ্ আল কুকী (১৬১); ২৫. আল হাফিজ ইসরাইল ইবনে ইউনুস ইবনে আবি ইশাক আস সাবী, আবু ইউসুফ আল কুফী(১৬২); ২৬. জাফর ইবনে জিয়াদ আল কুফী আর আহ্মার (১৬৫ বা ১৬৭); ২৭. মুসলিম ইবনে সারিম আল নাহ্দী, আবু ফারাহ্ আল কুফী; ২৮. আল হাফিজ কায়েস ইবনে আর রাবি, আবু মুহাম্মদ আল আসাদী আল কুফী (১৬৫); ২৯. আল হাফিজ হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্, আবু সালামাহ আল বসরী (১৬৭); ৩০. আল হাফিজ আবদুল্লাহ ইবনে লাহিআহ. আবু আবদির রাহমান আল মিশরী (১৭৪); ৩১. আল হাফিজ আবু উয়ানাহ্ আল ওয়াদ্দাহ্ ইবনে আবদিল্লাহ্ আল ইয়াসকুরী আল ওয়াসতি আল বাজ্জাজ (১৭৫-১৭৬); ৩২. আল কাদি শারীক ইবনে আবদিল্লাহ, আবু আবদিল্লাহ্ আল নাকাই আল কুফী (১৭৭); ৩৩. আল হাফিজ আবদুল্লাহ্ (বা উবায়দুল্লাহ) ইবনে উবায়দুর রাহ্মান (বা আবদুল রাহ্মান) আল কুফী, আবু আবদুর রাহমান আল আশজাঈ (১৮২). ৩৪. নূহ ইবনে কায়েস, আবু রাওয়াহ আল হুদ্দানি আল

বসরী (১৮৩); ৩৫. আল মুত্তালিব ইবনে জিয়াদি ইবনে আবি জাহারিহ আল কুফী, আবু তালিব (১৮৫); ৩৬. আল কাদি হাসান ইবনে ইব্রাহিম আল আনাজী, আবু হাশিম (১৮৬); ৩৭. আল হফিজ জারির ইবনে আবদিল হামিদ, আবু আবদিল্লাহ আদ দাব্বী আল কুফী ৎার রাজী (১৮৮); ৩৮. আল ফাদল ইবনে মুসা, আবু আবদিল্লাহ্ আল মারওয়াজি আল সিনানি (১৯২). ৩৯. আল হাফিজ মাহমুদ ইবনে জাফর আল মাদানি আল বসরী (১৯৩); ৪০. আল হাফিজ ইসমাইল ইবনে উলিল্লাহ আবু বিশর ইবনে ইব্রাহিম আল আসাদি (১৯৩); ৪১ আল হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম, আবু আমরিবন আবি আদিয়া আস সুলামী আল বাগরী (১৯৪); ৪২. আল হাবিজ মুহাম্মদ ইবনে খাজিম, আবু মু'আওয়িআ আত তামিম আদ ধার (১৯৫); ৪৩. আল হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে ফুদায়িল, আবু আবদির রাহমান আল কুফী (১৯৫) ৪৪. আল হাফিজ আল ওয়াকি ইবনে আল জাররাহ আর রুআসি আল কুফী (১৯৬); ৪৫. আল হাফিজ সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ, আবু মুহাম্মদ আল হিলালী আল কুফী (১৯৮); ৪৬. আল হাফিজ আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ির, আবু হিশাম আল হামাদানি আল খারিকি (১৯৯); ৪৭. আল হাফিজ হানাস ইবনে আল হারিথ ইবনে লাকিত আন-নাখাই আল কুফী; ৪৮. আবু মুহাম্মদ মুসা ইবনে ইয়াকুব আজ জামাই আল-মাদানি; ৪৯. আল আলা ইবনে সালিম আল-আত্তার আল কুফী; ৫০. আল আজরাক ইবনে আলী ইবনে মুসলিম আল হানাফী, আবুল যাম আল কুফী; ৫১. হানি ইবনে আয়ূব আল হানাফি আল কুফী; ৫২. ফুদাইর ইবনে মারজুক আল আঘার আর রুআসি আল কুফী (১৬০); ৫৩. আবু হামজা সা'দ ইবনে ওবায়দাহ আস সুলামি আল কুফী; ৫৪. মুসা ইবনে মুসলিম আল হিজামী আশ-শায়িবাণী, আবু ইসা আল কুফী আত-তাহান (মুসা আস সাগীর); ৫৫. ইয়াকুব ইবনে জাফর ইবনে আবি কাসির আল আনসারী আল মাদানী; ৫৬. ওসমান ইবনে সাদ ইবনে মুররাহ আল-কুরাইশি আবু আবদিল্লাহ (আবু আলী) আল কুফী।- *(পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩-৮১।)*

এভাবে এই হাদীস প্রতিটি যুগে বহু বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে হয়ে সত্যায়ীত হয়ে এসেছে। যারা এই হাদীস তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছে, আল আল্লামা আল আমিনি চৌদ্দশ শতকের অনুসারে তাদের একটা তালিকা প্রণয়ন করেছেন যাতে মণীষীদের সংখ্যা ৩৬০ জন।- *(পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩-১৫১।)*

কেউ কেউ এই হাদীস বর্ণনাকারীর বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্রই জানে যে, যদি কোন হাদিস বিশুদ্ধ হয়, তাহলে পৃথক পৃথক লোকের দেয়া বর্ণনায় আছে কি না তা জানার কোনো প্রয়োজন নেই। তবুও এই সন্দেহটাও যে অমূলক সে কারণে কিছু বিখ্যাত ঐতিহ্য বিশারদদের (মোহাদ্দেসীন)-এর .মতামত আমি এখানে রাখলাম।

২. গাদিরের হাদীস এর বর্ণনা

ক. আল হাফিজ আবু ইসা আত-তিরমিযী (মৃত্যু ২৭৯ হিজরী) তার সহীতে (সহী সিহা সিত্তাহ এর মধ্যে একটি) বলেন যে, "এটা একটা ভালো (হাসান) এবং সঠিক (সহী) হাদীস।"- আত তিরমিযীঃ আস সহীহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২৯৮।

খ. আল হাফিজ আবু জাফর আত-তাহাবী (মৃত্যু ৩২১ হিজরী) তার মুশকিলুল আসান গ্রন্থে বলেন যে, "এই হাদীস বর্ণনাকারীর (আসনাদ) ক্রমানুসারে সহীহ এবং এর বর্ণনাকারীর সাথে দ্বিতমত পোষণ করেননি।"-*(আত তাহারীঃ মুশকিলুল আশানা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা৩০৮।)*

গ. আবু আবদুল্লাহ আল হাকীম আল নেসাবুরী (মৃত্যু ৪০৫ হিজরী) তার আল মুস্তাদরাক গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই হাদীস-এ বর্ণনা করেন এবং বলেন যে 'এই হাদীস সহীহ"।- আল হাকিমঃ আল মুস্তাদারাক, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১০৯-১০।

ঘ. আবু মুহাম্মদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আল আসিমি বলেন যে, "উম্মাহ এই হাদীস গ্রহণ করেছে যার মুলনীতির দিক দিয়েও বেশ দৃঢ়তা রয়েছে। [আল আমিনিঃ আল গাদির, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ২৯৫।]

এই ঐতিহ্য বিশারদদের মতো অন্যান্যরাও (কয়েকশ' জনের মধ্যে) বলেন যে, "এই হাদীস সহী"ঃ-

১. আবু আবদুল্লাহ আল মহামিলি আল বাগদাদী তার আমিলি গ্রন্থে

২. ইবনে আবদিল বার আল কুরতুবি, তার আল ইশতিয়াব গন্থে

৩. ইবনুল মাযজিলি আশ-শাফিয়ী তার আল মানাকিব গ্রন্থে

৪. আবু হামিদ আল গাজ্জালী তার সিরুল আলামাইন গ্রন্থে

৫. আবুল ফারাজ ইবনে আল জাওয়াজী তার আল মানাকির গ্রন্থে

৬. সিবতে ইবনে আল জাওয়াজী তার তাদকিরাত খাওয়াছিল উম্মাহ গ্রন্থে

৭. ইবনে আবিল হাদিদ আল মুতাজিলি তার শারহ নাহজুল বালাগা গ্রন্থে

৮. আবু আবদিল্লাহ আল গাঞ্জী আশ সাফিয়ী তাঁর কিফা ওয়াতুত তালিব গ্রন্থে

৯. আবুল মাকারিম আলাউদ্দিন আস, সীম্মানী তার আল আরওয়াতুল উথ্‌কা গ্রন্থে

১০. ইবনে হাজার আল-আসকালীন তার তাহজিব আল তাহজিব তাহবাব গ্রন্থে

১১. ইবনে কাসীর আর-দিমাসকী তার তারিখ গ্রন্থে

১২. জালালুদ্দীন আস সিয়ুতি;

১৩. আল কাস্তালানী তার আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া গ্রন্থে

১৪. আবদুল হক আদ-দিহলায়ী তার শারহুল মিশকাত গ্রন্থে

১৫. ইবনে হাজার আল মাক্কী তার আস সাওয়াএকুল মুহরিকা গ্রন্থে

এবং আরে অনেকে।– *(পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৪-৩১৩।)*

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, উপরোক্ত মণীষীরা সবাই সুন্নী এবং সুন্নী আদর্শে একটি হাদীসকে তখনি 'সহী' বলা হয় যখন এটা নির্বিঘ্নে সেই সব লোকদের দ্বারা বর্ণিত হয় যারা সৎ, যাদের স্মৃতিশক্তি নিখুঁত এবং ভালো এবং তারা অস্বাভাবিক আচরণের (ভ্রান্ত) নন।– *(সুবীহ আস সাল্হিঃ উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহাতুহ, পৃষ্ঠা ১৪৫।)*

যদি কোন হাদীস এর আসনাদের উপরোক্ত গুণাবলী দেখা যায় কিন্তু তার এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তির মধ্যে সহী হওয়ার চেয়ে কম যোগ্য হন, তখন তাকে বলা হয় হাসান।– *(পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৫৬-৬০।)*

সুতরাং সুন্নী মণীষীরা যখন বলেন, গাদিরের হাদীস সহীহ তখন তারা এই বোঝাতেই চান যে, এর বর্ণনাকারীরা সৎ (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস বা কাজকর্মে গড়মিল নেই),। তাদের স্মৃতি ভালো এবং হাদীসেও কোনো ত্রুটি নেই বা অস্বাভাবিক ও নয়।

৩. মাওলার সাধারণ অর্থ

যেহেতু সুন্নীরা গাদিরের হাদীস–এর নিসংশয়তাকে অস্বীকার করতে পারেন না, তাই তারা একে চাপা দেবার জন্য 'মাওলা' শব্দটি হাদীস–এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন যার অর্থ 'বন্ধু', হযরত মুহম্মদ বোঝাতে চেয়েছিলেন "আমি যাদের যাদের বন্ধু, এই আলীও তাদের তাদের বন্ধু!'

এখানে উল্লেখ্য যে, নবী (সাঃ) এই ঘোষণার আগে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "আমি কি তোমাদের নফসের উপর তোমাদের চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান নই"। তাহারা সকলে বলেছিল, 'অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ"। তারপর তিনি বলেছিলেন, 'আমি যার যার পভু এই আলীও তার তার প্রভু।"

অসুবিধা কেবল এখানেই যে, গাদিরে উপস্থিত একটি লোকও এই অভিযোগ করার মতো অর্থটি ধরতে পারেনি। নবীর বিখ্যাত কবি হাসান ইবনে সাবিত একখানা কবিতা রচনা করে সেখানে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীকে শুনিয়েছিলেন যাতে রয়েছে–

নবী তখন তাকে বললেন 'হে আলী উঠে দাঁড়াও কেননা, আমিও খুশি হয়ে তোমাকে আমার পরে ইমাম ও পথ প্রদর্শক বানাচ্ছি।

নবী (সাঃ) যখন গাদীরে খুমে ইমাম আলী (আঃ)–এর মাওলার (প্রভূ) যে ঘোষণা দেন, তা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে, তখন হারিস বিন নোমানে ফাহরী নামে এক ব্যক্তি মদীনায় আসে এবং নিজ বাহন থেকে নেমে সেটাকে বেঁধে নবী (সাঃ)–এর নিকটে যায়, নবী (সাঃ) তখন মসজিদে নববীতে সাহাবাদের মাঝে বসেছিলেন; সে নবী (সাঃ)–এর কাছে গিয়ে খুব রাগান্বিত হয়ে বলতে থাকে, হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর একত্ববাদ মানতে বললেন, তা মেনে নিলাম, নামাজের হুকুম দিলেন, নামাজ পড়ি, রোজার হুকুম দিলেন, রোজা রাখি, হজ্ব করতে হুকুম দিলেন হজ্ব করি, যাকাত দিতে বললেন যাকাত দিই, তার পরও আপনি ক্ষান্ত হননি, আপনি আপনার চাচাত ভাই আলীকে আমাদের প্রভু (হাকিম) নিয়োগ করে দিলেন। এটা কি আপনি আপনার পক্ষ থেকে করেছেন, না আল্লাহর পক্ষ থেকে করেছেন। নবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, আল্লাহর পক্ষ থেকে করেছি। তখন হারিস বলল, "হে খোদা তিনি

(মোহাম্মদ) যা বলছেন যদি সত্য হয়, তবে যেনো আমার উপর আকাশ থেকে কোনো পাথর বা আযাব নাজিল হয়"।– সূরা মাআরিজ ১–২–৩। তফসির মাওলানা ফরমান আলী

এই বলে হারিস তার বাহনের কাছেও যাইতে পারে নাই আকাশ থেকে একটা ছোট পাথর তার মাথায় এসে পড়ে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায় এবং সে সেখানেই মারা যায়।

ওমর ইবনে খাত্তাব ইমাম আলী (আঃ)কে এই বলে স্বাগতঃ জানিয়েছিলেন যে, 'স্বাগতম, হে আবু তালিবের পুত্র আজ থেকে তুমি সকল মোমেন ও মোমেনার মাওলা (প্রভু), হয়ে গেলে।– *আল খতিব আত তাবারিঃ মিশকাতুল মাসাবিহ [পৃষ্ঠা ৫৫৭]; মীর খওয়ান্দঃ হাবিবুস সিয়ার [খন্ড১, পর্ব–৩, পৃষ্ঠা ১৪৪]; আত তাবারিঃ [আল উলাইয়াহ]; [আর রাজীঃ আত তাফসীরুল কবীর খন্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৯–৫০]; আহমাদঃ মাসনাদ [খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮১]; ইবনে আবি সায়বাহঃ আল–মুসান্নাফ; আবু ইয়ালাঃ আল মাসনাদ আহমাদ ইবনে উকদাহঃ এবং আরো অনেকে [আরো দেখুন আল আমিনিঃ আল গাদির খন্ড ১ পৃষ্ঠা ২৭০–৮৩]।*

মাওলার অর্থ যদি বন্ধু–ই হবে, তবে কেন এত স্বম্ভাসন জানানো? তার আগে কি ইমাম আলী (আঃ) বিশ্বাসী পুরুষ ও স্ত্রী লোকের শত্রু ছিলেন যে কারণে উমর বললেন যে, 'আজ তুমি আমাদের বন্ধু হলে?'

ইমাম আলী (আঃ) নিজেও একবার মুয়াবিয়াকে লিখে জানিয়ে ছিলেন, যে 'আল্লাহর নবী গাদির খুমের সেই দিনে তার কর্তৃত্ব সম্প্রদান করে আমাকে তোমাদের মাওলা নিযুক্ত করেছেন।– *(আল আমিনীঃ আল গাদির খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৪০।)*

কুরআন, আরবী ব্যাকরণ এবং সাহিত্যে বহু পণ্ডিত মণীষী মাওলা কে আওলা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যার অর্থ 'আরো কর্তৃত্বের অধিকারী পাওয়া'। উদাহরণ স্বরূপ সেই সব মণীষীদের নাম দেয়া যেতে পারে।

ইবনে আব্বাস (তার দুর্রে মানসুর এর তফসীরের মার্জিনে, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা নং ৩৫৫); আল কালবী (উদ্ধৃত করেছেন তার তাফসিরুল কাবির আর রাজী খন্ড ২৯–২২৭, আর রাজীর অত ১৭৮); আল ফারা, (আর রাজী ২৯–২২৭, পূর্বোক্ত; আল আলুসি, পূর্বোক্ত); আবু উবায়াদাহ মুয়াম্মার ইবনে মুখান্না আল বাসরী (আর রাজী, পূর্বোক্ত এবং আশ–শরিফ আল জুরজানি, শারুল মাওয়াকিফ খন্ড–৩ পৃষ্ঠ– ২৭১); আল–আখফাস আর আওসাত (তাঁর নিহায়াতুল–উকুল); আল বুখারী (তার সহীহ খন্ড–৭, পৃষ্ঠা ২৪০); ইবনে কুতাইবা (তার কুরতাইন খন্ড–২, পৃষ্ঠা ১৬৪); আবুল আব্বাস থালাব (তার আল শারুশ সাবাহ আল

মুয়াল্লাকা); জুরজানির আত তাবারি (তার তফসীরে , খন্ড ৯ পৃষ্ঠা ১১৭); আল ওয়াহিদি (তার আল ওয়াসিত); আথ-থালাবী (আল কাশফাওয়াল বয়ান এ); আজ জামাখশারী (আল কাশাফ এ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৫); আল নাসাফি (তার তফসীরে খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ২২৯); আল কাজিন আল বাগদাদী (তার তফসীরে খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ২২৯) এবং মুহিবুদ্দিন আফান্দি (তার তানজিলুল আয়াত গ্রন্থে)। - (দেখুন, আল আমিনীঃ আল গাদির পৃষ্ঠা ৩৪৪-৫০।)

৪. এই অনুষঙ্গে 'মাওলা'র অর্থ

এবার আমরা পরীক্ষা করে দেখবো এ হাদীস এর অনুষঙ্গ থেকে কোন ধরনের অর্থের অনুমানে আসা সম্ভব। যদি কোন শব্দের একাধিক অর্থ থাকে তবে তার মূল অর্থের অতিরিক্ত অর্থের দ্যোতনা বুঝতে এর প্রেক্ষাপট (কুরিনাহ) এবং অনুষঙ্গের দিকে তাকানো উচিৎ। এই হাদীসের প্রেক্ষাপট থেকে যে অর্থটি খাপ খায় তা হলো 'প্রভু'। নিম্নে এগুলোর কিছু উদাহরণ দেয়া হলোঃ-

প্রথমতঃ ঘোষণা দেবার অব্যবহিত পূর্বে নবী উম্মার নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তা হলোঃ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, " তোমাদের নিজেদের উপরে নিজের যে কর্তৃত্ব আমি কি তার চেয়ে অধিক কর্তৃপক্ষ নই?' তখন তারা বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই' তারপর নবী ঘোষণা দিলেন- ''আমি যাদের যাদের মাওলা এই আলীও তাদের তাদের মাওলা"

কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এখানে 'মাওলা' শব্দের ঘোষণায়। শব্দের অর্থ আওলা (অধিক কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া), যা পূর্ববর্তী প্রশ্নে উথাপন করা হয়েছে। অন্ততঃ ৬৪ জন সুন্নী ঐতিহ্য বিশারদ পূর্ববর্তী প্রশ্নটিকে উল্লেখ করেছেন; যাদের মধ্যে রয়েছেন আহমদ ইবনে হামবাল, ইবনে মাজাহ, আন নাসায়ী এবং আত-তিরমিযী। - *(পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭১।)*

দ্বিতীয়তঃ ঘোষণা দেবার পরপরই মহানবী যে দোয়াটি করেন তা হলোঃ- "হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাসো, যে আলীর শত্রু তুমি তার শত্রু হও, যে আলীকে সাহায্য করো তুমি তাহাকে সাহায্য করো, আর যে তাকে পরিত্যাগ করে তুমিও তাকে পরিত্যাগ করো"।

এই দোয়া দেখিয়ে দেয় যে, সেদিন আলী এমন কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন যাতে কিছু লোক তার শত্রুও হতে পারে (এই দায়িত্ব একজন শাসকের ছাড়া আর কিছুরই হতে পারে না); আর সে দায়িত্ব পালন

করতে তার প্রয়োজন পড়তে পারে সাহায্যকারী ও সমর্থকদের। এক্ষেত্রে কোন 'বন্ধুত্ব' রক্ষা করতে কি সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়?

তৃতীয়তঃ নবীর ঘোষণায় ছিলো "আমার সময় আসন্ন বলে মনে হচ্ছে যে, আমাকে ডাকা হবে (আল্লাহর তরফ থেকে) এবং আমি তার উত্তরে সাড়া দেবো। এ থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি নিজের মৃত্যুর পর মুসলমানদের নেতৃত্বের জন্য আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন।

চতুর্থতঃ সাহাবীদের স্বাগত জানানো এবং আনন্দের প্রকাশ এই ঘোষণার অর্থে 'মাওলা' কোনই সংশয়ের অবকাশ রাখে না।

পঞ্চামতঃ সেই অনুষ্ঠানের সময় এবং স্থান সম্বন্ধে ভাবুন একবার, নবী মাঝ দুপুরে তার যাত্রা থামিয়ে আরব মরুভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রায় এক লাখ লোককে এবং কাঁটাময় তপ্ত বালুতে বসালেন, উটের গদিগুলো একত্র করে মঞ্চ বানিয়ে দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন, তারপর এই আয়োজনের সবশেষে শুধু কি এতটুকু ঘোষণা দিলেন যে, 'আমাকে যারা ভালোবাসে তারা এই আলীকেও ভালোবাসেন কিংবা আমি যাদের যাদের বন্ধু এই আলীও তাদের তাদের বন্ধু'!

এই ঘটনা কি মানুষের সাধারণ জ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য? না, কিন্তু উপরোক্ত ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু লোক আবার নবীকে এই শিশুসুলভ ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করতেও কসুর করেন না।

১১. ইমাম আলী(আঃ) নবীর 'সত্তা'

আলী ইবনে আবু তালেবের খিলাফতের নির্দেশ সম্বলিত অনেক আয়াতই রয়েছে কিন্তু সবগুলোকে এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব শুধু একটি আয়াত যা মুবাহেলাহ (ধিক্কার অভিসম্পাত) এর ঘটনা উল্লেখ করা হলো এটি ঘটেছিল নবম হিজরীতে।

সে বছর চৌদ্দজন খ্রীস্টানদের একটি দল নাজরান থেকে পবিত্র নবীর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। নবীকে দেখে তারা জিজ্ঞেস করেছিল 'যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কে আপনার মতামত কি? পয়গম্বর বললেন, আজ আপনারা বিশ্রাম করুন আপনারা পরে এর উত্তর পাবেন। পরদিন যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কে কুরআনের তিনটি আয়াত (৩ঃ৫৯-৬১) নাজিল হলো। কিন্তু খ্রীস্টানরা যখন আল্লাহর এই বাণীগুলো গ্রহণ না করে নিজেদের বিশ্বাসে অনড় রইলো তখন মহানবী নিম্নলিখিত আয়াতগুলো তিলওয়াত করলেন-

আস, আমি আমার সন্তানদের ডাকি তোমরা তোমাদের সন্তানদের ডাক এবং আমি আমার নারীদেরকে ডাকি তোমরা তোমাদের নারীদেরকে ডাক। আমি আমার নফসকে ডাকি তোমরা তোমাদের নফসকে ডাক।আবার আমরা খোদার কাছে দোয়া করি যে, মিথ্যাবাদীর উপর তোমার (খোদার) লানত বর্ষণ কর। সূরা আল এমরান ঃ ৬১।

পরদিন একদিকে বেরিয়ে এলো খ্রীস্টানেরা অন্যদিকে নিজের বাড়ি থেকে ইমাম হোসেনকে কোলে করে ইমাম হাসানের হাত ধরে এলেন নবী (সাঃ)। তার পিছনে মা ফাতিমা (আঃ) এবং তার পিছনে ইমাম আলী (আঃ)। এই পবিত্র পাঁচটি আত্মাকে দেখে তখন খ্রীস্টান পাদরীরা তাদের সঙ্গে মোবাহেলা করতে অস্বীকার করে এবং তার পরিবর্তে জিজিয়া কর দিতে রাজি হয়ে যায়। জাবির ইবনে আবদিল্লাহ আনসারীর বর্ণনা মতে এই আয়াতে 'পুত্রগণ' হলেন ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন 'স্ত্রী লোকগণ' হলেন মা ফাতেমা (আঃ) এবং 'আমার সত্তা' হলেন মহানবী ও আলী। এইভাবে আলী ইবনে আবু তালিবকে মু'বাহালা'হ এর আয়াত অনুসারে বলা হয় "নবীর 'সত্তা'"। এ থেকে এটাই পাওয়া যায় নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কারো সন্ধান করা যেমন অন্যায়, তেমনিভাবে আলীকেও অতিক্রম করাটাও অন্যায়- কেননা আল্লাহর কথানুসারে তিনিও নবীরই সত্তা। তাকে যে অতিক্রম করতে চায় সে আসলে নবীকেই অতিক্রম করতে চায়।

১২. ঐতিহ্যসমূহ

গাদিরের এই ঘোষণার পর আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ) এর খিলফাত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তবু এ বিষয়ে কিছু হাদীস এর অবতারণা বোধহয় প্রাসঙ্গিক হবে।

মহানবী তাঁর হাদীসে সাকালায়েন এ বলেন- আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি- আল্লাহর পুস্তক এবং আমার আহলে বায়াত। যদি তোমরা তাদের সাথে থেকে তাদের অনুসরণ করো এবং কখনোই পরিত্যাগ না করো তাহলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তারাও কাওসারে (বেহেশতী হৃদ) আমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।

এখন তাহলে সকল ক্ষেত্রেই স্বীকার করা যাক আলী ইবনে আবু তালিব কেবল আহলে বায়াত-এর একজনই নন বরং তিনি হলেন আহলে বায়াত এর নেতা সুতরাং তার আনুগত্য স্বীকার করাটা যে বাধ্যতামূলক তা এই ঘটনার ঐতিহ্য থেকে প্রমাণিত হলো।- অধিকাংশ ঐতিহাসিক গ্রন্থেই এই হাদীস পাওয়া যায়।- *(এবার দেখুন আত তিরমিযীঃ আল সহীহ খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৩০৮; ইবনে আসিরঃ উসদুর ঘাবাহঃ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১২; আশ সিয়ুতিঃ দুর্রে মানসুর খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭; আল মুত্তাকী আল হিন্দীঃ কানজুল আম্মাল (হায়দারাবাদ, ১৩১২ হিজরী), পৃষ্ঠা ৪৮।)*

আরো একটি হাদীস রয়েছে যার নাম হাদীস এ মানজিলাহ। মহানবী তাবুক (নবম হিজরীর রজব মাসে) অভিযানে যাওয়ার আগে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন ইমাম আলী (আঃ)কে। আতংকে ইমাম আলী (আঃ) বলে উঠলেন, "আপনি আমাকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন?" মহানবী তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে আলী! তুমি কি আমার সাথে এই সম্পর্কে খুশি নও যাহা ছিলো মুসা ও হারুনের মাঝে, কেবল ব্যতিক্রম এটিই যে আমার পর কোনো নবী নেই।?"

মহানবী এর দ্বারা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, মুসা যখন স্বর্গীয় নির্দেশ পাবার জন্য যান তখন নিজের লোকদের দেখা শোনার ভার তিনি দিয়ে যান হারুনের উপর, ঠিক তেমনিভাবে নবীর অনুপস্থিতি ইসলামের সকল দিক দেখার দায়িত্ব তিনি ইমাম আলী (আঃ)-এর উপর দিয়ে গেলেন। - *(ইবনে মাজাহঃ আস সুনান পৃষ্ঠা ১২; আহমদঃ আল মাসনাদ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৪; আন নাসায়ি আল খাসাইস পৃষ্ঠা ১৫-১৬; আত তৌহিদীঃ মুশকিলুল আশার খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৩০৯; আল মুহিব আত তাবারিঃ দাকাইরুল উকবা পৃষ্ঠা ৬৩।)*

সুরা-আল বারাত (অধ্যায়-৯) মক্কায় কাফিরদের জানানোর ঘটনাটাতে আমরা দেখি প্রথমে আবু বকরকে এই আয়াত দিয়ে অগ্নি উপাসকদের সামনে এটা ঘোষণা করতে পাঠানো হলো পরে নবী ইমাম আলীকে পাঠালেন আবু বকরের কাছ থেকে সুরাটি নিয়ে মক্কায় গিয়ে ঘোষণা করতে। মাঝ পথ থেকে মদীনা ফিরে এসে আবু বকর মহানবীকে জিজ্ঞেস কররেন যে, তার এই সূরা ঘোষণার বিরুদ্ধে আল্লাহর তরফ থেকে কোন আয়াত বা নির্দেশ নাজিল হয়েছে কি না। মহানবী বললেন, "জিব্রাইল আমার কাছে এসে বললেন, এই সূরা কেবল আমি বা

আমার অংশীদার ভিন্ন কেউ যেন না পড়ে।" – *(সিয়ূতিঃ আদ দুর্রে মানসুর খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ২০৯; আত তাবারিঃ আত তাফসীর খন্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪৭; আল নাসায়ী ঃ আল খাসাইস পৃষ্ঠা ২০।)*

নবীর এই ঘোষণায় যে অংশটি প্রাধান্য হয়ে উঠেছে আরেক ঐতিহ্যেও ঠিক সেটির সন্ধ্যান পাওয়া যায় এবং সেটিও ইসলামের সকল গোত্রের কাছেই গ্রহণীয়। নবী বললেনঃ 'আলী রয়েছে সত্য'র সাথে এবং সত্য রয়েছে আলীর সাথে। তিনি দোয়া করেন, "হে আল্লাহ! সত্যকে সেই দিকে ফিরে দাও যেদিকে আলী যায়।"–*(আল খাতিব আল খাওয়ারিজমীঃ আল মানাকিব পৃষ্ঠা ৫৬; আল হামুঈঃ ফারাই দুস সিমতাঈন খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৬; আল খাতিব আল বাগদাদীঃ তারিখ বাগদাদ খন্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩২১; তাওফাতুর ইসনা আসার, শাহ্ আব্দুল আজিজ মহাদ্দেসে দেহলভি।)* এভাবেই সঠিক খিলাফত্ব আলীকে দেয়া হয়েছিল আর কাউকেই নয়।

'স্বর্গীয় আলো' (হাদীসে নূর) বিষয়ে আরেকটি হাদীস রয়েছে। সৈয়দ আলী হামাদানী তার মাওয়াদ্দাতুল কুরবা গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসী বর্ণনা মতে যে, নবী বললেনঃ "আদমের সৃষ্টির চার হাজার বছর পূর্বে একই নূর (স্বর্গীয় আলো) থেকে আমাকে ও আলীকে দু'জনকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আদম কে সৃষ্টি করা হলে সেই নূর তার মেরুদন্ডে গিয়ে স্থান পায়। আমরা সেভাবে চলে আসছিলাম কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের ক্ষেত্রে এসে আমরা পৃথক হয়ে যাই। সে কারনে আমি লাভ করি নবীত্ব আর সে খিলাফত্ব।" রিয়াদুল ফাদাইল এ এই হাদীসের শেষ শব্দগুলো লেখা হয়েছে এভাবেঃ ''তারপর তিনি আমাকে নবী বানালেন আর আলীকে বানালেন ওয়াসি (উত্তরসূরী)।– *(মাফাতিহুল মাতালিব পৃষ্ঠা ৩৯৬; আল গাঞ্জীঃ কিফায়াতুত তালিব পৃষ্ঠা ৭৬ এ যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।)*

১৩. উলিল আমর কে অবশ্যই মাসুম হতে হবে

আল্লাহ কোরানে বলেনঃ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং তার রাসুলের আনুগত্য কর এবং তাহাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং যদি

তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা আল্লাহ্ এবং তার রাসুলের দিকে সমর্পণ করে দাও, যদি তুমি আল্লাহ এবং কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী হও। ইহাই হবে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। সূরা নেসা ৫৯।

আয়াত মুসলমানদের দু'টি অনুগত্যের নির্দেশ দেয়, প্রথম, আল্লাহর আনুগত্য, দ্বিতীয় পয়গম্বর ও তৃতীয় 'তোমাদের ভেতর যাদের উপর ক্ষমতা অর্পিত' (উলিল আমির মিনকুম) তাদের প্রতি আনুগত্য।. শব্দের বিন্যাস থেকে দেখা যায় উলিল আমার এর প্রতি আনুগত্য পয়গম্বরের প্রতি আনুগত্যের মত সমানভাবে বাধ্যতামূলক। স্বাভাবিকভাবেই তাহলে এটা বোঝা যায় যে, উলল আমরকে হতে হবে পয়গম্বরের সমান ক্ষমতার, নতুবা আল্লাহ্ তাদের দু'জনকে এই আয়াতে একত্রিত করতেন না।

কে উলিল আমর সেটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে, পয়গম্বরের প্রতি আনুগত্যের এই নির্দেশের দিকে তাকালে কিছুটা সুবিধা হবে; দেখা যাবে কত বিশাল ও পরিব্যপ্তী এই নির্দেশ এবং আল্লাহর পয়গম্বর কতোটা ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্ কোরানে বলেন, ***এবং আমরা কোন রাসুল পাঠাইনি কিন্তু ইহার জন্যই যে আল্লাহর হুকুমে তার আনুগত্য করে।*** (সূরা নেসা ৬৪)।

অনুসরণ করতে হবে; অনুসারীদের ভাবা উচিত না যে নবীর প্রতিটি কাজ দেখে তার পর তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে সেটি মানবে কি না। স্পষ্টভাবে এটা বলে দেয় যে, নবী ও পয়গম্বররা ভুল পাপ থেকে মুক্ত নতুবা আল্লাহ্ বিনাশর্তে তাদের মানতে বলতেনও না।

বহু আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহ্ নবীকে মানার নির্দেশ দিয়েছেনঃ ***হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে মেনে চলো এবং তার পয়গম্বরকে মানো।*** *- আল কুরআন, ৪৭ঃ৩৩; আরো দেখুন ৩ঃ৩২, ১৩২; ৫ঃ৯২; ৮ঃ১, ২০, ৪৬; ২৪ঃ৫৪; ৫৮ঃ১৩, ৬৪ঃ১২।*

আবার তিনি বলেন, ***যে আল্লাহ এবং তার পয়গম্বরকে মানে.....।*** একই সুরায় আবার বলা হয়েছেঃ ***যে পয়গম্বরকে মানে সে আসলে আল্লাহকেই মানে।*** (সূরা নেসা–৮০) *– আল কুরআন, ৪৭ঃ১৩; আরো দেখুনঃ ৪ঃ৬৯; ২৪ঃ৫২; ৩৩ঃ৭১; ৪৮ঃ১৮। তাছাড়াও কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহর আনুগত্য ও পয়গম্বরের আনুগত্য সমানভাবেই দেখা গেছে।*

এই কথাটা মিথ্যা হতো যদি পয়গম্বররা মাসুম (ভ্রান্তিহীন) না হতেন। এবারে স্মরণ করা যাক নিম্নোক্ত আয়াতটিঃ.......... তাদের কাউকে মেনে চলো না যারা পাপী এবং অকৃতজ্ঞ (৭৬ঃ২৬)। ছবিটি তাহলে পরিষ্কার; নিষ্পাপ নবীদের মানতে হবে পাপীদের মানা চলবে না, এবং একমাত্র উপসংহার হলো এটাই যে নবীরা পাপী বা ভ্রষ্ট নন, অন্য কথায় তারা মাসুম (ভ্রান্তিহীন)।

কেবল সেই অসম্ভব পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখুন একবার যে কোনো এক নবী তার অনুসারীদের একটি পাপ বা ভুল করতে বাধ্য করছে। সেই হতভাগ্য অনুসারীরা যে ক্ষেত্রেই হোক আল্লাহর মনক্ষুণ্নির কারণ হবে। তারা যদি নবীকে মানে এবং অন্যায় করে তবে তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করছে এবং করুণা বঞ্চিত হবে। অপরপক্ষে যদি তারা নবীকে না মানে সুতরাং তারা নবীর প্রতি আনুগত্য বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ মানছে না। ফলে দেখা যায় যে একজন অমাসুম ভ্রান্তিযুক্ত নবী লোকদের করুণা বঞ্চিত এবং অপরাধী ভিন্ন কিছুই বানাবে না।

ইসলামের পবিত্র নবীর দিকে তাকিয়ে আল্লাহ বলছেনঃ

এবং নবী যাহা দেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা থেকে বিরত রাখেন তাহা থেকে বিরত থাকো" । সূরা হাসর-৭)।

এর অর্থ এই যে নবীর যে কোন অনুমতি বা নিষেধ এর সাথে আল্লাহর ইচ্ছার মিল রয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে, নবী মাসুম ছিলেন। যে মানুষ অভ্রান্ত নয় তার বিষয়ে এত জোর দিয়ে নির্দেশ কেউই দেবে না।

আরেকটি আয়াতে রয়েছে যে, ***যদি তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন ।*** (সূরা আলে এমরান ঃ৩১) এখানে আল্লাহর ভালোবাসা ও নবীর প্রতি আনুগত্য পরস্পর সাপেক্ষ হয়ে উঠছে। দু'পাশের ভালোবাসাই এতে রয়েছে। যদি আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন তাহলে নবীকে অনুসরণ করুন বা যদি আপনি নবীকে ভালোবাসেন তবে আল্লাহও আপনাকে ভালোবাসবেন। এটাই কি প্রমাণ করে না যে, নবী যে কোন ধরনের অন্যায় থেকে মুক্ত?

কেবল তার কাজ নয়, তার কথাগুলোও আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ কুরআনে বলেনঃ ***(তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না খোদার অহি ব্যতীত ।***(সূরা জুমা-৩-৪)।

যতখানি ভ্রান্তিহীন হবার কথা ভাবা যায় সেই পরিমান অভ্রান্তি পরিচয় আমরা এক্ষেত্রে পাচ্ছি।

আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে নবীর কথা বলা হয়েছেঃ *এবং তাহাদের মধ্যে থেকে এক রাসূল (মোহাম্মদ), যিনি তাদের সম্মুখে আয়াতের তেলাওয়াত করেন এবং তাহাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাহাদের কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দেন।* সূরা জুমা-২। আরো দেখুনঃ ২ঃ১২৯; ৩ঃ১৬৪।

কি করে একজন নবী নিজে খাঁটি না হয়ে অন্যকে অন্যায় ও পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে? যদি একজন লোকের সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে চিহ্নিত করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে কি করে জ্ঞানের শিক্ষা দেবে; কিংবা আরো খারাপ ভাবলে, যদি তার খারাপ কাজ করাকে প্রতিহত করার মতো ইচ্ছা শক্তি না থাকলো? কি করে নবী মানুষকে আল্লাহর গ্রন্থ শিক্ষা দেবেন; তার অর্থ তিনি আল্লাহর সকল নির্দেশ জানেন। তিনি লোকদের পরিশুদ্ধ করবেন এবং জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। সুতরাং তিনি পূর্ব থেকে জ্ঞানী এবং পরিশুদ্ধ ছিলেন।

কুরআনে তার চরিত্র সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো- *এবং নিশ্চই আপনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী।* সূরা কালাম ঃ৪। যে লোক ভুল করতে পারে সে এতবড় মর্যাদাও পেতে পারে না।

এই আয়াতগুলো দুটো জিনিষ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে প্রথমতঃ লোকদের উপর মহানবীর কর্তৃত্ব অসীম এবং সবক্ষেত্রেই। তার দেয়া যে কোন নির্দেশ, যে কোন ক্ষেত্রেই, যে কোন খানেই, যে কোন সময়েই বিনাশর্তে পালন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব তাকে দেয়া হয়েছে কারণ তিনি মাসুম (নিষ্পাপ) এবং যে কোন ধরনের অন্যায় এবং পাপ থেকে মুক্ত। নতুবা আল্লাহ্ আমাদের বিনাশর্তে তাকে মেনে চলবার হুকুম করতেন না।

এই আয়াতে, উলেল আমারকে মুসলিমদের উপর ঠিক একই পরিমাণ কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে কারণ 'পয়গম্বর' এবং উলেল আমার দু'জনকে এক সাথে নির্দেশ করে বলা হয়েছে- "মেনে চলো'; যা এটাই দেখিয়ে দেয় যে উলেল আমার এর প্রতি আনুগত্য ও পয়গম্বরের আনুগত্য একই বুঝায়

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যা চলে আসে তা হলো উলেল আমারও অবশ্যই মাসুম (নিষ্পাপ) এবং যে কোন ধরনের পাপ ও ভুল থেকে মুক্ত। নতুবা তার প্রতি আনুগত্য এবং নবীর প্রতি আনুগত্য একই সাথে বর্ণিত হতো না। আমিরুল মুমেনিন আলী (আঃ) বলেছেনঃ "যে আল্লাহকে মানে না তাকে মানা উচিত নয়; আনুগত্য কেবল আল্লাহর প্রতি, তার পয়গম্বরের প্রতি এবং যাদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত তাদের প্রতি। নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দেন (লোকদের প্রতি) তার পয়গম্বরকে মানতে কারণ তিনি নিষ্পাপ ও পবিত্র (পরিশুদ্ধ), আর তিনি কখনো লোকদের আল্লাহর অবাধ্য হতে বলবেন না; এবং নিশ্চয় তিনি এরও নির্দেশ দেন (লোকদের প্রতি) যাদের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে তাদের মানতে কারণ তারা নিষ্পাপ ও পবিত্র (পরিশুদ্ধ) এবং তিনিও লোকদের আল্লাহর অবাধ্য হতে বলবেন না।
– *(আস সাদুকঃ ইলালুস শারাঈ [খন্ডন ১ পৃষ্ঠা ১২৩)*

১৪. উলেল আমার এর অর্থ কি মুসলিম শাসক?

আমাদের অনেক সুন্নী ভাই উলেল আমারকে 'তোমাদের ভেতরে যারা শাসক' বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যার অর্থ দাঁড়ায় মুসলিম শাসক। এই ব্যাখ্যার কোনো যুক্তিগত কারণ নেই; এটা সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস বিকৃতি। মুসলিমদের সিংহভাগ শাসক ও রাজাদের অধীনস্ত থেকে কুরআন ও ইসলামকে ক্ষমতার তুষ্টির জন্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা ও পূনর্ব্যাখ্যা করেছে।

মুসলিমদের ইতিহাস (অন্য যে কোন জাতির মতোই) মুসলিম শাসকদের নামে ঠাসা, যাদের আয়েশ ভোগ বিলাস, অন্যায় অত্যাচার, ও নিষ্ঠুরতা ইসলামের নামকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। পাঠক এদের পরিচয় সংক্ষেপে পরবর্তী পর্বটিতে পাবেন। এমন শাসক সর্বদাই ছিল এবং থাকবে এবং আমাদের জানানো হলো যে, আয়াতে উল্লেখ করা উলেল আমার হলেন এরাই।

যদি আল্লাহ আমাদের এমন রাজা ও শাসকদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন তাহলে মুসলিমদের জন্য এক অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হবে। হতভাগ্য অনুসারীরা আল্লাহর মনঃক্ষুণ্ণের কারণ হবে, তারা কি করলো সেটা মোটেই বিবেচ্য হবে না। তারা যদি শাসকদের মানে তাহলে তারা

আল্লাহর সেই নির্দেশ অমান্য করলো "কখনো একজন পাপীকে মেনে চলো না"। আর যদি তারা ই রাজাদের না মানে তাহলে তারা আল্লাহর সেই নির্দেশটি অমান্য করলো 'মুসলিম রাজাদের মেনে চলো'। সুতরাং যদি আমরা এই ব্যখ্যাকে মেনে নেই তাহলে মুসলিমরা চিরকালীন উভয় সংকটে পড়বে যে তারা অমাসুম শাসককে মানবে কি মানবে না।

তদুপরি বিভিন্ন বিশ্বাসী ও বিভিন্ন মতালম্বী মুসলিম শাসক রয়েছে যেমন শাফিয়ী, ওহাবী, মালিকী, হানাফী, হাম্বালীর সাথে রয়েছে শীয়া ও ইবাদীরা। এখন ধরা যাক এই ব্যাখ্যা অনুসারে যে সুন্নী মুসলিমরা ইবাদী সুলতানের অধীনে বাস করছে (যেমন ওমানে) তারা ইবাদী মতালম্বন করবে এবং যারা শীয়া শাসকের অধীনে বাস করছে (যেমন ইরানে) তারা শীয়া মতালম্বন করবে। তাহলে এই লোকগুলোকে এই স্বঘোষিত ব্যাখ্যার দ্বারা অপরাধী করা কি ঠিক হবে?– *(আর রাজীঃ তাফসীরুল কাবির খন্ড ১০ পৃষ্ঠা ১৪৪।)*

বিখ্যাত সুন্নী ভাষ্যকার ফাকরুদ্দিন আর রাজী তার তাফসীরুল কবীর গ্রন্তটি এই বাক্য দিয়ে শেষ করেছেন যে, এই আয়াত প্রমাণ করে যে উলেল আমারকে অবশ্যই মাসুম হতে হবে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে আল্লাহ লোকদের বিনাশর্তে উলেল আমারকে মেনে চলতে বলেছেন; সুতরাং একজন উলেল আমার–এর মাসুম হওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ তাদের কোন প্রকার পাপ করার সম্ভাবনা থাকে না। তারপর তিনি পাঠককে আহলে বায়াত পাঠে বিরত রেখেছেন এই তত্ত্ব ঘাটিয়ে যে মুসলিম উম্মাহ সামগ্রিকভাবে মাসুম। এই ব্যাখ্যা সামান্য কেননা, কোন মুসলিম মণীষীর এতে কোন ভূমিকা নেই এবং এটা কোন ঐতিহ্য ভিত্তিকও নয়। এটা বিস্ময়কর যে আর রাজী পৃথক পৃথকভাবে ব্যক্তি মুসলমানকে অমাসুম ধরে পরক্ষণে মুসলিম জাতিকে মাসুম বানাচ্ছেন। এমনকি একজন প্রাইমারী স্কুল ছাত্রও জানে যে ২০০টা গরু যোগ ২০০টা গরু সমান ৪০০টা গরু হয়, একটা ঘোড়া নয়।

কিন্তু আর রাজী বলেন যে, ৭০০শ' অমাসুম যোগ ৭০০শ' অমাসুম সমান একজন মাসুম! তিনি কি আমাদের বিশ্বাস করাতে চান পাগলা গারদের সবগুলো লোক মিলে একজন সুস্থ মানুষ।

প্রাচ্যের কবি ইকবাল বলেছে–

দুশ' গাধার মাথা থেকে একজন মানুষেরও সমান চিন্তা উৎপন্ন হতে পারে না। নিশ্চিতভাবে, উলেল আমারকে মাসুম হতে হবে এই গভীর জ্ঞান তার আছে কিন্তু তিনি এক কুসংস্কারের বশতঃবর্তী হয়ে মুসলিম উম্মাহকে সামগ্রিকভাবে মাসুম বলছেন। এমনকি তিনি আয়াতে 'মিনকুম' শব্দটিকে (তোমাদের ভেতর) খেয়ালের সুযোগ পাননি, যা প্রমাণ করে উলুল আমর ও মুসলিম উম্মাহ'র অংশ , কখনোই সমগ্র মুসলিম জাতি নয়। যদি পুরো জাতিকেই মানতে হয় তাহলে মানার বাকি রইলো কে?

১৫. উলেল আমার এর সঠিক অর্থ

এবার আমরা উপরোক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যায় ফিরে আসি। ইমাম জাফর আস সাদিক (আঃ) বলেছিলেন যে, এই আয়াত নাজিল হয়েছিল আলী ইবনে আবু তালিব, হাসান এবং হোসেন (আঃ)–এর জন্যে। একথা শুনে একজন, ইমামকে জিজ্ঞাসা করেন যে, লোকে বলেল– 'আল্লাহ কেন তার গ্রন্থে আলী ও তার পরিবারের নামের উল্লেখ করেন নি?'

ইমাম উত্তর দিয়েছিলেন– 'তাদের বলো যে আল্লাহ সালাত (নামাজ)–এর আদেশ দিয়েছেন কিন্তু বলেন নি কয় রাকাত পড়তে হবে; আল্লাহর পয়গম্বরই এটা ব্যাখ্যা করেছেন। আবার যাকাত এর হুকুম নাজিল হলো কিন্তু আল্লাহ বলে দেননি প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম; আল্লাহর পয়গম্বর এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং হজ্ব (মক্কায় তীর্থযাত্রা)–এর হুকুম করেছেন কিন্তু ৭ বার তওয়াফ (কাবা'র চতুর্দিক প্রদক্ষিণ) করতে বলেননি– আল্লাহর পয়গম্বর এটা ব্যাক্যা করেছেন। সেভাবেই এ আয়াতও নাজিল হয়েছে– "আল্লাহকে মেনে চলো, পয়গম্বরকে এবং তোমাদের ভেতর যাদের উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছে তাদের মেনে চলো এবং এটা নাজিল হয়েছে ইমাম আলী, হাসান এবং হোসেন (আঃ)–এর বিষয়ে"।– *(আল আয়াসীঃ আত তাফসীর খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৯–৫০; ফাইয়াদ আল কাশানিঃ আত তাফসীর (আস শাফী) খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৪।)*

কিফায়াতুর আথার এ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল আনসারী থেকে পাওয়া এই বর্ণনা মতে ব্যাখ্যামূলক ঐতিহ্য পাওয়া যায়। যখন এটা নাজিল হয় জাবির নবীকে বলেন, "আমরা আল্লাহ ও তার নবীকে জানি

কিন্তু কর্তৃত্ব প্রাপ্ত এই লোকরা কারা যাদের কথা আপনার ও আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে"। নবী উত্তর দিলেন, ' তারা হলো আমার পরে মুসলিমদের ইমাম ও খলিফা। তাদের প্রথমজন হলো ইমাম আলী, ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেন তারপর ইমাম আলী যে ইমাম হোসেনের পুত্র, তারপর মুহাম্মদ যে হবে আলীর পুত্র যার কথা তৌরাতে আল বাকির হিসেবে উল্লিখিত আছে। হে জাবির! তোমার সাথে তার দেখা হবে। তাকে দেখলে আমার সালাম (শান্তি কামনা) জানিও। তার পর আসবে তার পুত্র জাফর আস সাদিক (সত্যবাদী); তারপর আসবে জাফরের পুত্র মুসা, তারপর মুসার পুত্র আলী, তারপর ইমাম আলীর পুত্র মুহম্মদ, তারপর মুহম্মদের পুত্র আলী এবং তারপর আলীর পুত্র হাসান।

"তারপর আসবে তার পুত্র যার নাম এবং আমার নাম ও এক হবে। সে পৃথিবীতে হুজ্জাতুল্লাহ (আল্লাহর প্রমাণ) এবং মানুষের মধ্যেও বাকি আতুল্লাহ (সত্যের করণ রক্ষার জন্য আল্লাহ যাকে নির্ধারণ করেছেন)। সে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমগ্র পৃথিবীর বিজয়ী হবে। ততদিন সে অনুসারী ও বন্ধুদের চোখ থেকে গোপন থাকলে যেন উম্মাহ হৃদয়ে কেবল এই বিশ্বাস বেঁচে থাকে যার বিশ্বাসের পরীক্ষা নেবেন স্বয়ং আল্লাহ।

জাবির বললেন, "হে আল্লাহর বাণীবাহক! তার এই নির্জনতা থেকে কি অনুসারীরা লাভবান হবে?"

নবী উত্তর দিলেন," হ্যাঁ! তার দ্বারাই হবে যিনি আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। তারা তখন তার আলো দেখে চলবে। তার নির্জনতার সময় তার ভালোবাসা, কর্তৃত্ব থেকে তারা লাভবান হবে যেমন লোকেরা মেঘের আড়ালে সূর্য থাকলেও তা থেকে লাভবান হয়। হে জাবির! এটা আল্লাহর গোপন কথা এবং সংগুপ্তী জ্ঞান। সুতরাং তাদের ছাড়া সবার কাছ থেকে একে রক্ষা করো যারা এটা জানবার দাবীদার।"- *(আল খাজ্জাজঃ খিফায়তুল আশার পৃষ্ঠা ৫৩।)*

এই হাদীস শীয়া উৎস হতে পাওয়া। সুন্নী ঐতিহ্য এত বিস্তারি ভাবে কিছু বলা নেই, যদিও বারোজন ইমাম সম্পর্কে সুন্নী ঐতিহ্যে উল্লেখ আছে, সেটি পাঠক পরবর্তী অধ্যায়ে জানবেন। এখন আমরা জানি 'যাদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত' হলো তারাই যাদের ক্ষেত্রে অত্যাচারী বা অন্যায়ী

শাসক এসব প্রশ্নের কোনো অবকাশই থাকে না। এই আয়াতের কারণে অন্যায়, অত্যাচারী, অশিক্ষিত, স্বার্থপর, নিমজ্জিত এবং নিষ্ঠুর শাসকদের মেনে চলার কোনো প্রয়োজন মুসলমানদের নেই; আসলে নির্দিষ্ট করা বারো জন ইমামকে মেনে চলার নির্দেশই তাদের দেয়া হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই নিষ্পাপ এবং যে কোন অশুভ চিন্তা ও কাজ থেকে মুক্ত। তাদের মেনে চলার কোন ঝুঁকি নেই। উপরন্তু সকল ঝুঁকি থেকে তারা সবাইকে রক্ষা করবেন; কারণ তারা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন হুকুম দেবেন না এবং মানুষকে ভালোবাসা, ন্যায় ও ক্ষমার চোখে দেখবেন।

১৬. বারোজন খলিফা বা ইমাম

আল হাফিজ সুলাইমান ইবনে ইব্রাহিম আল কান্দুজি আল হানাফির ইয়া নাবিউর মাওয়াদ্দাহ গ্রন্থের ৭৭তম অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে উল্লেখ করা এ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক। একটি সর্বজ্ঞাত রয়েছে যে 'বারো জন খলিফা হবেন এবং প্রত্যেকেই হবেন কুরাইশ বংশ থেকে'। সহী বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ এবং আত তিরমিযীসহ বহুখানেই এটা রয়েছে।

লেখক বহু ঐতিহ্য উল্লেখ করে দেখিয়েছেন নবীর একথাটি বলেছেন যে, আমি, আলী, হাসান, হোসেইন এবং হোসেনের নয় জন বংশধর হবে পরিশুদ্ধ ও পাপমুক্ত।

তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন যে নবী ইমাম হোসেনকে বলেছেন, ''তুমি একজন নেতা, একজন নেতার ভাই' তুমি একজন ইমাম, একজন ইমামের পুত্র ও একজন ইমামের ভাই; তুমি হলে একজন প্রমাণ (আল্লাহর), একজন প্রমাণ (আল্লাহর) এর পুত্র, একজন প্রমাণ (আল্লাহর) এর ভাই এবং নয়জন প্রমাণ (আল্লাহর) এর পিতা যাদের নবমতম জন হবে আল মাহদী।"

এরকম বহু ঐতিহ্যের উল্লেখ করে তিনি লিখছেন, 'কিছু মণীষী বলেছেন যে, এই ঐতিহ্য (যা দেখায় যে নবীর পর খলিফার সংখ্যা বারো) বহু আসনাদ থেকে পাওয়া এবং সর্বজ্ঞাত। এখন আমরা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনাকারী অতিক্রমনের সাথে সাথে হাদীস এ উল্লেখিত নবীর বারোজন খলিফার সাক্ষাৎ পাবো, তারা হবে তার আহলে বায়াত হতে এবং তার বংশধররা। কারণ, "এই হাদীস কেবল সাহাবীদের ভেতর

থেকে হওয়া চারজন খোলাফায়ো রাশেদীন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কেননা তাদের সংখ্যা বারোর কম"। "এবং উমাইয়া গোত্রের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য নয় কেননা– (ক) তারা ছিলো বারো জনের অধিক (খ) তাদের প্রত্যেকে ছিলো অন্যায়ী ও অত্যাচারী (কেবল ওমর ইবনে আজিজ' ছাড়া) এবং (গ) তার বনু হাশিম গোত্রের ছিলো না কেননা, নবী এক হাদীসে বলেন যে, "তাদের প্রত্যেকেই আসবে বনু হাশিম থেকে।"। "এটা আরো প্রযোজ্য হবে না বনু আব্বাসের ক্ষেত্রে কারণ– (ক) তারা বারোজনের বেশী (খ) তারা এ আয়াত মানেনি (এর দাবী মানেনি)– ***হে রাসুল বলে দিন যে, আমি রিসালাতের পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে কিছুই চাই না, শুধু আমার নিকট আত্মীয় (আহলে বায়াত)–এর মুয়াদ্দাত (মুহব্বত) ব্যতীত।*** সূরা শুরা ঃ ২৩ বনু উমাইয়া খলিফাদের মত তারা এর ঐতিহ্যের (হাদীসুল খিসা) –এর সাথে (অর্থাৎ তারা নবীর বংশধরদের বিরুদ্ধাচারণ করছিল)।

'সুতরাং এই হাদীস ব্যাখ্যার একমাত্র উপায় হলো যে এটা পবিত্র নবীর আহলে বায়াত ও তার বংশধরদের ভেতর থেকে হবে সেটা মেনে নেয়া কারণ তাদের সময়ে তারা ছিলো সর্বোচ্চ জ্ঞানী, সর্বোচ্চ প্রতিভাধর, খোদাভীরু, ধার্মিক, পরিবার সূত্রে বড়, ব্যক্তিগত গুণাবলীতে অসামান্য এবং আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ সম্মানিত; তারা তাদের জ্ঞান পেয়েছেন পিতাদের দ্বারা তার পিতৃপুরুষের কাছ থেকে (নবীর) এবং এসেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে এবং সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা নিয়ে।– *(আল কান্দুজিঃ ইয়ানবীউল মাওয়াদ্দাহ পৃষ্ঠা ৪৪৪–৪৭।)*

১৭. বারো জন ইমাম (আঃ) গণের বিষয়ে কিছু তথ্য

প্রথম ইমামঃ আমিরুল মোমেনিন আবুল হাসান আলী মুর্তাজা। ইনি আবু তালিবের পুত্র জন্মেছিলেন কাবার ভেতরে ১৩ই রজব, নবীত্ব ঘোষণার ১০ বছর আগে (৬০০ খৃঃ)। ২৮ শে সফর ১১ হিঃ/৬৩২–এ নবীর ইন্তেকালের পর ইনিই হলেন প্রথম ইমাম। বিষ মাখানো তরবারি দ্বারা ইবনে মুলজাম এর হাতে কুফার মসজিদে (ইরাক) নামাজ পড়ার সময় ভীষণভাবে আহত হন এবং তার দু'দিন পর ২১শে রমজান ৪০হিঃ/৬৬১ তে শাহাদত বরণ করেন। নাজাফ আল আশরাফে (ইরাকে) তাঁকে কবর দেয়া হয়।

দ্বিতীয় ইমামঃ আবু মুহাম্মদ হাসান আল মুজতবা। ইনি ইমাম আলী (আঃ)–এর পুত্র। মদীনায় ১৫ই রমজান ৩হিঃ/৬২৫ শে জন্মেছিলেন। মদীনায় ৭ বা ২৮শে সফর ৫০হিঃ/৬৭০ এ বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করা হয়।

তৃতীয় ইমামঃ সৈয়দুস শুহাদা আবু আবদুল্লাহ আল হোসেন। ইনি ইমাম আলী (আঃ)–এর পুত্র। মদীনায় জন্মেছিলেন ৩রা শাবান ৪/৬২৬ এ। তিনি তার পুত্র, আত্মীয়–স্বজন ও সঙ্গীসহ ১০ই মহররম ৬১/৬৮০ তে কারবালায় (ইরাক) শহীদ হন। তিনি এবং তাঁর ভাই আল হাসান ছিলেন পবিত্র মহানবীর কন্যা ফাতিমা জাহরা (আঃ)–এর পুত্র।

চতুর্থ ইমামঃ আবু মুহাম্মদ আলী জয়নুল আবেদীন। ইমাম হোসেন (আঃ)–এর পুত্র। জন্মেছিলেন ৫ই শবান ৩৮/৬৫৯ এ। মদীনায় ২৫শে মহররম ৯৪/৭১২ বা ৯৫/৭১৩তে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয।

পঞ্চম ইমামঃ আবু জাফর মুহাম্মদ আল বাকের। আলী জয়নুল আবেদীন (আঃ)–এর পুত্র জন্মেছিলেন ১লা রজব ৫৭৭, মদীনায়। ৭ই জ্বিলহজ্ব ১১৪/৭৩৩ মদীনায় তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

ষষ্ঠ ইমামঃ আবু আবদুল্লাহ জাফর আস সাদিক (আঃ)। মুহম্মদ আল বাকেরের (আঃ) পুত্র জন্মেছিলেন ১৭ই রবিউর আউয়াল ৮৩/৭০২ তে মদীনায়। ২৫শে শাওয়াল ১৪৮/৭৬৫তে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়।

সপ্তম ইমামঃ মুসা আল কাজিম। জাফর আস সাদিক (আঃ)–এর পুত্র। জন্মেছিলেন ৭ই সফর ১২৯/৭৪৬শে আল আবওয়ায় (মদীনা থেকে ৭ মাইল দূরে)। ২৫শে রজব ১৮৩/৭৯৯ তে বাগদাদে হারুন অর রশিদ এর কারাগারে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। বাগদাদ (ইরাক) এর কাছে আল কাজিমিয়াতে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

অষ্টম ইমামঃ আলী আর রেজা (আঃ)। মুসা আল কাজিম (আঃ) এর পুত্র জন্মেছিলেন ১১ই জ্বিলকদ ১৪৮/৭৬৫ তে; ১৭ই সফর ২০৩/৮১৮ তাঁকে বিষ প্রয়োগে মাসাদে (খোরাসান, ইরান) হত্যা করা হয়।

নবম ইমাম মুহাম্মদ তাকি জাওয়াদ। আলী তাকি, জাওয়াদ। আলী আর রেজা (আঃ)'র পুত্র। জন্মেছিলেন ১০ই রজব ১৯৫/৮১১ তে মদীনায়। ৩০ মে জ্বিলকদ ২২০/৮৩৫ তাকে বাগদাদে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। আল- কাজিমিয়াহ তে তার দাদার কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

দশম ইমামঃ আলী নাকী আল হাদী। ইনি মুহম্মদ আত তাকি (আঃ)–এর পুত্র। জন্মেছিলেন ৫ই রজব ২১২/৮২৭ এ। মদীনায়। ৩রা রজব ২৫৪/৮৬৮ তে তাঁকে সামারা (ইরাক)তে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

একাদশ ইমামঃ আবু মুহাম্মদ হাসান আসকারী। আলী আন নাকী (আঃ)–এর পুত্র। জন্মেছিলেন ৮ই রবিউস সানী ২৩২/৮৪৬ এ মদীনায়। ৮ই রবিউল আউবাল ২৬০/৮৭৪ এ বিষ প্রয়োগে তাঁকে সামারায় (ইরাক) হত্যা করা হয়।

দ্বাদশ ইমামঃ আবুল কাসিম মুহাম্মদ আল মাহদী। হাসান আসকারী (আঃ)–এর পুত্র জন্মেছিলেন ১৫ই সাবান ২৫৫/৮৬৯–এ সামারায় (ইরাক)। তিনি আমাদের বর্তমান ইমাম। ২৬০/৮৭৪ এ তিনি ছোট গুপ্ত সাধনায় অন্তর্হিত হন এবং সেটি চলে ৩২৯/৮৪৪ পর্যন্ত। তারপর বড় গুপ্ত সাধনা শুরু হয়েছে যা আরো চলবে। আল্লাহ যখন তাকে অনুমতি দিবেন তখন তিনি পৃথিবীতে অন্যায় ও অত্যাচারের রাজত্ব সরিয়ে ন্যায় ও সমতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পুনরায় আবির্ভূত হবেন। তিনি হলেন আল কাইম (একজন যিনি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করবেন) আল হুজ্জাত (সৃষ্টির কাছে আল্লাহর প্রমাণ); সাহেবুজ্জামান (আমাদের সময়ের প্রভু) এবং সাহেবুল আমার (এমন একজন যাকে বেহেশতী কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করা হয়েছে)।

তৃতীয় পর্ব

সুন্নী দৃষ্টিকোণ

১৮. খিলাফত্ব বিষয়ে সুন্নী দৃষ্টিকোন

আজকের দিনে সুন্নীদের অধিকাংশই হলো আশারীর প্রতি বিশ্বাসী। আশারী এবং মুতাজিলাদের বক্তব্য যে ইমামত বা খেলাফত এর প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের ওয়াজিব। তবে দুই দলের মধ্যে এইটুকুন পার্থক্য যে মুতাজিলারা ভাবে যুক্তিগতভাবেই এটা তাদের দায়িত্ব আর আশারীদের বক্তব্য এটা হাদিসের আলোকে ওয়াজিব।

আল নাসাফি তার আল আকাইদ এ লিখেছেনঃ 'মুসলিমরা ইমাম ছাড়া চলতে পারে না, যে নিজের দ্বারা তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে, হুদুদ (আইন ব্যবস্থা) চালু করবে, সীমান্ত পাহারা দেবে, যোদ্ধাদের অস্ত্র সজ্জিত করবে, তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটাবে, ডাকাতি চুরি বা রাহজানি ঠেকাবে, শুক্রবার ও ঈদ-এর নামাজ পড়াবে, লোকদের ভেতরের ঝগড়া মেটাবে, যোগ্য দাবীদারের চিহ্নিত করবে যার অভিভাবক নেই সেই এতিমকে বিয়ে করবে এবং যুদ্ধলব্ধ মালামাল বন্টন করবে।"– *(আত তাফ্তজানিঃ শাবাহ আকাইদীন নাগাফি পৃষ্ঠা ১৮৫।)*

"সুন্নীরা একজন পার্থিব শাসক চায়......., যেখানে শীয়ারা চায় পৃথিবীতে এক বেহেশতী রাজ্য স্থাপন করতে এবং পৃথিবীর সকল অশুভ বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাতে।"– *(ডব্লিউ, এম, মিরারঃ বাবুল হাদী আশার এর অনুবাদ, দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৯৮।)*

সুন্নীরা খলিফা নিয়োগের ক্ষেত্রে চারটি আদর্শের কথা বিবেচনা করে–

১. ইজমাঃ এটা হলো যে কোন বিষয়ে ক্ষমতাবান ও বিশিষ্ট লোকদের মতৈক্য। নবীর সকল অনুসরণকারীর মত এতে প্রয়োজন নেই কিংবা উম্মাহর সকল ক্ষমতাবান ও মর্যাদাবান লোকের মতামতেরও প্রয়োজন নেই।

২. পূর্ববর্তী খলিফার মনোনয়ন।

৩. শুরা ঃ এটা হলো একটা দল গঠন করে, তাদের মাধ্যমে নির্বাচন করানো।

৪. সামরিক শক্তিঃ এর অর্থ হলো কেউ যদি সামরিক শক্তি ঘটিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে তবে সে খলিফা হবে।

শারহুল মাকাসিদ এর লেখক যেভাবে একে ব্যাখ্যা করেন তা হলো যদি কোন ইমাম মারা যায় এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোক যদি তার স্থান দাবী করে (কোন আনুগত্যের শপথ ছাড়াই-বয়াত তাকে দেয়া হয় এবং মনোনয়ন করা হয়) তবে তার খিলাফত্বের দাবী তাকে দেয়া হয় এবং মনোনয়ন করা হয়। তবে তার খিলফত্বের দাবী গ্রহণ করা হবে যদি জনগণ তার ক্ষমতার বশবর্তী হয় এবং নতুন খলিফা যদি অশিক্ষিত বা নীতিবিহীনও হয়। তবুও ঘটনাটা প্রায় একই হবে। যদি এভাবেই কোন খলিফা অধিক ক্ষমতা নিয়ে আসে এবং পরে অন্য কারো বশ্যতা গ্রহণে বাধ্য হয় তবে আগে বাতিল ঘোষণা করে বিজয়ীই, খলিফা বা ইমাম হিসেবে গৃহীত হবে।- *(আল তাফতাজানিঃ শারহুল মাকাসিদিত তালিবীন (খন্ড ২, পৃসষ্ঠা ২৭২ আরো দেখুন হাফিজ আলী মুহাম্মদ এবং আমিরুদ্দীনঃ ফুলকুন নাজাত ফিল ইমামা ওয়া সালাত খন্ড ১ পৃষ্ঠা ২০৩।)*

১৯. খলিফার যোগ্যতা

সুন্নীরা বিশ্বাস করে নিম্নলিখিত দশটি যোগ্যতা থাকলে সে খলিফা হতে পারবে-

(১) তাকে মুসলমান হতে হবে

(২) তাকে বয়স্ক হতে হবে (প্রাপ্তবয়স্ক)।

(৩) তাকে পুরুষ হতে হবে।

(৪) তাকে মানসিকভাবে সুস্থ্য হতে হবে।

(৫) তাকে উদ্যমী হতে হবে।

(৬) তাকে মুক্ত মানুষ হতে হবে, দাস হলে চলবে না।

(৭) তার কাছে মানুষের প্রবেশাধিকার থাকবে সে সুরক্ষিত বা গোপন থাকতে পারবে না।

(৮) তাকে যুদ্ধ পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে এবং রণকৌশল বিষয়ে অবহিত হতে হবে।

(৯) তাকে ন্যায় বিচারক হতে হবে- আদিল।

(১০) আইন ও ধর্ম বিষয়ে তাকে বিচার করে সিদ্ধান্ত দেয়ায় সক্ষম হতে হবে অর্থাৎ তাকে একজন মুজতাহিদ হতে হবে– (*আত তাফতাজানিঃ পূর্বোক্ত।*)

'কিন্তু শেষ দুটি শর্ত কেবল তত্ত্বমাত্র। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেমনটা বলেছিলো যে একজন অশিক্ষিত ও নীতিবিহীন লোকও খলিফা হতে পারে। সুতরাং 'ন্যায় বিচার' ও 'ধর্ম জ্ঞান' ভিত্তিহীন বাক্য মাত্র।

তারা ভাবে যে ভ্রান্তিহীনতা (ইসমাত) খলিফার জন্য অপরিহার্য বিষয় নয়। আবু বকর মহানবীর সাহাবীদের সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা এ কথার সমর্থনে উদ্ধৃতি যোগ্যঃ তিনি বললেন, 'যদিও আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই তবুও আমাকে তোমাদের শাসক নিয়োগ করা হয়েছে; যদি আমি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করি তবে আমাকে সাহায্য করো; যদি আমি ভুল করি তবে তোমাদের দায়িত্ব আমাকে ঠিকপথে পরিচালনার। তোমরা জানো আমার কাছে প্রায়শই শয়তান আসে সুতরাং যদি আমি রেগে যাই আমার কাছ থেকে দূরে থেকো।– (*আস সিয়ুতি, তারিখুল খুলাফা পৃষ্ঠা ৭১।*)

আত তাফতাজানি তার শারাহ্ আকাইদিন–নাসাফি বলেন, 'নীতিহীনতা বা অত্যাচারের কারণে একজন ইমাম এর ইমামত খারিজ করে দেয়া চলে না। – আত তাফত্জানিঃ পূর্বোক্ত।

২০. আবু বকর এর ক্ষমতায় আরোহণ

উপরোক্ত নীতিগুলো কোরআন বা হাদীস থেকে আসেনি বরং পবিত্র মহানবীর ইন্তেকালের পর ঘটা বিভিন্ন ঘটনা ও কারণ থেকে এসেছে।

সুন্নীদের মতে প্রথম চার খলিফা হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন (সঠিক পথে পরিচালিত খলিফা)। এবারে আসুন বিচার করে দেখা যাক কিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনরা এলেন।

নবীর ইন্তেকালের সাথে সাথে মদীনার আনসার (সাহায্যকারী) নামে পরিচিত মুসলিমরা বনু সাঈদায় সাকিফাহ (ছাদসহ বারান্দা) তে সমবেত হলেন। সিয়াতুর লুগহাত এর লেখকের মতানুসারে সেটা ছিলো জাহেলী যুগে অসৎ আরবদের কোন অসৎ উদ্দেশে মিলিত হবার গোপন আস্তানা।– (*গিয়াসুদ্দিনঃ গিয়াসুল লুঘাত পৃষ্ঠা ২২৮–৩০।* এখানে সাদ ইবনে

উবাদাহ, যে তখনও অসুস্থ তাকে কম্বল জড়িয়ে বেশ রাজকীয় লেবাসে চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো যেন সে খলিফা নিযুক্ত হতে পারে। সাদ তারপর আনসারদের গুণাবলীর প্রশংসা করে একটা বক্তৃতা দিলো এবং তাদের বললো আর কোথাও কেউ এ কাজ করার আগে তারা যেন তাকে খলিফা বানায়। আনসাররা তার কথায় রাজী হয়ে তাকে খলিফা বানাতে চাইলো কিন্তু, তখন তারা নিজেদের ভেতরেই বলাবলি করতে লাগলো যে কুরাইশ মুহাজিরানরা (মক্কা থেকে আগত লোকেরা) এলে কি জবাব দেবো, তারা যদি একে সরিয়ে নিজেদের দাবী নিয়ে আসে।

একটা দল বললো, 'তাহলে বলবো তোমাদের ভেতর থেকে একজনকে নাও' সাদ বললো 'এটা হলো তোমাদের দেখানো প্রথম দুর্বলতা।'

ওমর ইবনে খাত্তাবকে কেউ একজন এই বলে সমাবেশটার কথা জানিয়ে গেল যে 'খুব বেশী দেরী হওয়ার আগে সাকিফাতে চলে যাও, যদি শাসনকর্তার আসন পেতে চাও, নতুবা কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে পরে তাকে বদলাতে ঝামেলা হতে পারে।' কথা শোনামাত্র ওমর আবু বকর সহ সাকিফাতে ছুটে এলেন, সাথে এলেন আবু ওবায়দা ইবনে জারাহ। – *(আত তাবারিঃ আত তরিকাহ খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮২০; ইবনুল আসিরঃ আল কামিল সাম্পাদনা সি, জে, টনর্বাগ, লেইডেন ১৮৯৭, খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৩২৫; ইবনে কুতায়বাহঃ আল ইমামাহ ওয়া সিয়াতসা, কায়রো, ৩৮৭/১৯৬৯, খন্ড–১ পৃষ্ঠা ১৮।)* আত তাবারী। ইবনুল আসির, ইবনে কুতাইবা এবং অন্যান্যরা তাদের বর্ণনাতে বলেন, যে সাকিফাহ তে পৌছে আবু বকর, ওমর এবং আবু ওবায়দায় কোনমতে বসবার জায়গা পেলেন, তখন সাবিত ইবনে কায়েস দাঁড়িয়ে আনসারদের গুণাবলী বর্ণনা করছে, সে প্রস্তাব করলো আনসারদের ভেতর থেকেই কারো এই খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। পরে ওমর ঘটনাটিকে এভাবে বলেন যে, "আনসারদের ভেতরকার বক্তা যখন বক্তৃতা শেষ করলো তখন আমি ইতিমধ্যেই ভেবে রাখা গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম কিন্তু আবু বকর ইঙ্গিতে আমাকে নিশ্চুপ থাকতে বললেন। ফলে আমিও নীরব রইলাম। আবু বকরের সম্পূর্ণতা এবং জ্ঞান আমার চেয়ে বেশী। এরপর তিনি বক্তৃতায় আমি যে বিষয়গুলো ভেবেছি সেগুলোই বললেন, বরং আরো ভালো করে বললেন।

রাওদায়াতুস সাফা অনুসারে আবুবকর সাকিফাহ এর লোকদের এভাবে সম্বোধন করেন যে, "হে সম্মিলিত আনসারবৃন্দ। আমরা তোমাদের ভাল গুণাবলী ও যোগ্যতা জানি। আর ইসলাম রক্ষার জন্য যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করেছো তাও ভুলিনি। কিন্তু এটা তো তোমরা জানো যে আরবদের ভেতর কুরাইশরা অন্যসব গোত্রের কাছে সম্মানীয় এবং সম্ভবতঃ আরবরা এ দায়িত্ব কুরাইশ বংশের কেউ ছাড়া অন্য কাউকে দেবে না।"– *(মীর খওয়ান্দঃ রাওয়াদাতুস সাফা খন্ড–২, পৃষ্ঠা ২২১।)*

আশ সিরাহ আল হাবিবুল্লাহতে এর পরও এটুকু আছে যে, যা হোক, এটা সত্যি যে আমরা মুহাজিররাই প্রথম ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করি। ইসলামের নবীও ছিলেন আমাদেরই গোত্রের। আমরা পয়গম্বরের আত্মীয়....... এবং তাই আমাদেরই কারো এই সম্মান পাওয়া উচিত। এটাই সবচেয়ে ভালো হবে যে আমাদের ভেতরই কেউ নেতৃত্ব পাক আর তোমরা হও তাদের মন্ত্রণাদাতা। তোমাদের সাথে পরামর্শ না করে আমরা কোনো কাজ করবো না।" –*(আল হালাবীঃ আশ শিরাহ, খন্ড–৩, পৃষ্ঠা ৩৫৭।)*

প্রচুর বাকবিতন্ডার ও যুক্তির মধ্যে ওমর চেঁচিয়ে উঠলেন যে, 'আল্লাহর কসম, যে আমাদের বিরোধীতা করবে তাকে খুন করে ফেলবো।' খাজরাজ গোত্রের একজন আনসার আল হুবাব ইবনে আল মুনজীর ইবনে জায়েদ তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলে উঠরেনঃ 'আল্লাহর কসম, আমাদের উপর অন্য কাউকে খলিফা হতে দেবো না। তোমাদের ভেতর থেকে আসবে একজন এবং আমাদের ভেতর থেকে আসবে একজন। আবু বকর বললেন, 'না, সেটা হতে পারে না; এটা আমাদের অধিকার যে, আমরা শাসক হবো, আর তোমরা হবে মন্ত্রণাদাতা।' আল হুবাব বললো 'হে আনসারগণ! এই লোকেরা যা বলে সে কথার কাছে নিজেদের সমর্পণ করো না। শক্ত হও....... খোদার কসম, আমার কথার প্রতিবাদ করার সাহস যদি কেউ করে আমি এই তরোয়ার দিয়ে তার নাক কেটে দেবো' ওমর মন্তব্য করলেন 'খোদার কথামতো, দু'জন খলিফা হওয়া ঠিক না। একই রাজত্বে দু'জন রাজা থাকতে পারে না, আরবরা তোমাদের নেতৃত্বে রাজী হবে না কারণ মহানবী তোমাদের গোত্রের নয়।

আত তাবারি এবং ইবনুল আসির দু'জনেই বর্ণনা করেন যে এরপর শান্তভাবে আল হুবাব এবং ওমর এ বিষয়ে অনেকক্ষণ বাক্য বিনিময় করেন। ওমর আল হুবাবকে অভিশাপ দেন " আল্লাহ তোমাকে মেরে ফেলুক" আল হুবাব উত্তর দেন " আল্লাহ তোমাকেও মেরে ফেলুক"।

এরপর ওমর সামনে এগিয়ে সাদ ইবনে উবদাহ এর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ব ে ন, "আমরা তোমাদের প্রত্যেকটা হাঁড় ভেঙ্গে দেবো" ধমকের ফলে ক্রোধ ন্ধ হয়ে সাদ দাঁড়িয়ে পড়ে ওমরের দাঁড়ি ধরে বসেন। ওমর বলেন, 'যদি একটা চুল ও ছেড়ে তবে তোমার সাথের কেউ আস্ত রইবে না। তারপর আবুবকর ওমরকে শান্ত ও ভদ্র হতে অনুরোধ করেন। সাদের দিক থেকে ওমর মুখ ঘুরিয়ে নেন তখন সাদ বলে চলছিল, 'খোদার কসম, আমার যদি দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে মদীনার প্রতিটি কোনায় তোমরা সিংহের গর্জন শুনতে পেতে এবং গর্তে লুকাতে। খোদার কসম, আমি তোমাকে দ্বিতীয়বার সেই মানুষদের মাঝে পাঠাবো যেখানে সাধারণ হয়েছিলে, নেতা হতে পারনি।

ইবনে কুতাইবাহ বলেন, যখন আউশ গোত্রের নেতা বশির ইবনে সাদ লক্ষ্য করেন যে আনসাররা খাজরাজ গোত্রের প্রধান সাদ ইবনে উবাদাহ এর পিছে গিয়ে সম্মিলিত হচ্ছে তখন প্রতিহিংসা বশে তিনি দাঁড়িয়ে কুরাইশ মুহাজিরদের পক্ষে দাবী তোলেন।

আনন্দ চীৎকারের মাঝখানে ওমর আবুবকরকে বলেন যে আপনি আপনার হাতটা বাড়ান যেনো আপনাকে আমি বায়াত দিতে পারি। আবু বকর বললেন, "না, তোমার হাতটাই বরং বাড়িয়ে দাও যেনো আমি বয়াত দিতে পারি, কারণ তুমি আমার চেয়ে শাক্তিশালী এবং খিলাফতের জন্য উপযুক্ত।" ওমর আবু বকর এর কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এই বলে তার প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন যে, আপনার মেধা ও কৃতিত্বের তুলনায় আমার শক্তির কোনো মূল্য নেই। আর এর যদি কোন মূল্য থেকেও থাকে তবে আপনার খিলফাত্বের সাথে এটা যুক্ত হলে আপনি সফল হবেন।

বশির ইবনে সাদ আনুগত্য মেনে নিল। খাজরাজ গোত্রের লোকরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো যে, যদি সাদ ইবনে উবায়দাহ এর প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এই কাজটা করেছে। তারপর আউস গোত্রের লোকেরা নিজেদের ভেতর বলাবলি করতে লাগলো যে, যদি সাদ ইবনে উবায়দাহ কোনদিন খিলাফত্ব পায় তবে খাজরাজ গোত্রের লোকেরা নিজেদের আউসের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাববে এবং আউসের কেউ কোনদিন তাদের সমান সম্মান পাবে না। সে কারণে তারা সকলেই আবু বকরের আনুগত্য স্বীকার করলো

খাজরাজদের একজন তলোয়ার খাপ থেকে বের করলো কিন্তু বাকিরা তাকে সামলে রাখলো।

বর্তমানে অনেককে বলতে শোনা যায় যে, রাসুলাল্লাহ (সাঃ) ইন্তেকালের তিন চার দিন আগে তার অসুস্থতার কারণে আবু বকরকে নামাজের ইমামতী করতে হুকুম দেন এবং পরে নিজেই তার পিছনে নামাজ আদায় করেন। ইহাই নাকি আবু বকরের খলিফা হওয়ার ইঙ্গিত বহন করতো।

'বানী সাকিফাতে তিনদিন পর্যন্ত কথা কাটাকাটি, দাড়ি ধরে টানাটানি, ধস্তাধস্তি, মারামারি চললো। কে খলিফা হবে তা নিয়ে কিন্তু কই একজনও তো বলেনি যে মিয়ারা তিনদিন আগেই না নবীর হুকুমে তোমরা সবাই আবু বকরের ইমামতীতে নামাজ পড়েছ কেন তাকে খলিফা বানাচ্ছো না? অন্ততঃ আবু বকরকে বলা উচিত ছিল যে, তোমরা আমার পিছনে নামাজ পড়েছ। (যদি সত্যি সত্যি তিনি নামাজ পড়িয়ে থাকতেন) কারণ সেই দিন কোন লড়াই হতো না। এক দিনই খলিফা নির্বাচন হতো। কিন্তু সাকিফাতে সেই দিন কেহ সে কথা বলে নাই এখন যাহা বলা হচ্ছে।

আসলে এইসব কথা অনেক পরে উমাইয়াদের রাজত্বকালে রচনা করা হয়েছে। সম্পাদক।

যখন তাহারা এইসব তর্কাতর্কি ও বিবাদে লিপ্ত সে সময় ইমাম আলী (আঃ) তার সঙ্গীদের নিয়ে মদীনায় মহানবীর মৃতদেহকে গোসল করাচ্ছিলেন এবং কবর এর বিভিন্ন কাজকর্মের তদারকী করছিলেন। ইতিমধ্যে এদিকের ঘটনা শেষ হয়ে গেল আবু বকর পেয়ে গেলেন নেতৃত্ব।

ইবনে কুতায়বাহ লিখেছেন, "যখন আবু বকর খিলাফত্ব গ্রহণ করেছেন তখন আলীকে তার সামনে হাজির করা হয় এবং তিনি বার বার বলছিলেন, ' আমি আল্লাহর দাস এবং আল্লাহর বার্তাবাহকের ভাই।' তারপর ইমাম আলী (আঃ)কে আবু বকরের আনুগত্য স্বীকারের হুকুম করা হলো। আলী বললেন, "খিলাফত্বের প্রতি আপনাদের যে কারো চেয়ে আমার অধিকার বেশী। আমি আপনার আনুগত্য করবো না। সত্যি বলতে, আপনাদেরই উচিত আমার আনুগত্য স্বীকার করা। আপনি আনসারদের এটাই বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহার বার্তাবাহকের সাথে আপনার রক্ত সম্পর্ক

আছে। আপনি তার পরিবারের সদস্য, এই বলে আমাদের কাছ থেকে খিলাফত্ব কেড়ে নিয়েছেন। আপনি কি আনসারদের এটা বোঝাননি যে, খিলাফত্বের প্রতি আপনার দাবী বেশী, কারণ আপনি পয়গম্বরের আত্মীয় এবং তারা তাতে আপনার হাতে ক্ষমতা দিয়ে আপনার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে? যে যুক্তিটা আপনি আনসারদের সামনে দেখিয়েছেন তা আমি আরো একটু এগিয়ে নিয়ে দেখাচ্ছি। নবীর সাথে আমাদের জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় যে সম্পর্ক তা আপনাদের যে কারো চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ। আপনি যদি আপনার যুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন তবে আপনাকে ন্যায় বিচার করতে হবে; নতুবা আপনি জেনে রাখুন যে, আপনি সজ্ঞানে ক্রমশঃ অত্যাচারের দিকে ধাবিত হচ্ছেন।'

৩। ওমর বললেন, "তুমি বয়াত না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে না।' ইমাম আলী (আঃ) চীৎকার করে বলে ওঠেন "ওলান যখন তোমাদের হাতে তখন যত পারো দুধ বের করে নাও। যত শক্ত করে পারো আজ একে ধরে রাখো কারণ আগামীকাল তিনিই এটা তোমার হাতে তুলে দেবেন। ওমর, তোমার নির্দেশের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করবো না, 'আমি তার হাতে আমার ন্যায়ানুগত্যকে তুলে দেবো না।' শেষমেশ আবু বকর বললেন, 'হে আলী! তুমি যদি আমাকে রায়ত না দাও এর জন্য আমি আর পীড়াপীড়ি করবো না।

২১. সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

উপরোক্ত ঘটনার বিভিন্ন দিক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(১) এটা আরবদের প্রথা যে যদি কেউ কোন ঘোষণা দেয়, যদি সে কোন ছোট দলের হয়েও গোত্রের প্রধান হতে চায় অন্যরা কেউ তার প্রতিবাদ করে না এবং যেন তেন প্রকারে তার অধীনে চলে যায়। এই কথাটা হযরতের চাচা আব্বাসের মনে ছিলো তাই তিনি ইমাম আলী (আঃ) কে বলেছিলেন, " তোমার হাত দুটো দাও, আমি যেন তোমার আনুগত্য স্বীকার করতে পারি...... কারণ যদি একবার তুমি এটা গ্রহণ করো তাহরে কেউ তোমাকে তা পরিত্যাগ করতে বলবে না।" আর এটাই ছিলো সেই ঐতিহ্য যার কারণে সাদ আনসারদের প্ররোচিত করেছিলেন যে, আর কেউ খিলাফত্ব গ্রহণের আগেই তারা যেন সেই দায়িত্ব তাকে দেয় এবং এটাই সেই ঐতিহ্য যে কারণে ওমরকে বলা হয়েছিলো "খুব

বেশী দেরী হওয়ার আগে সাকিফায় চলে যাও, নতুবা কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে পরে তাকে বদলানো কঠিন হতে পারে" এবং এক্ষেত্রেও প্রথানুযায়ী ঘটনা ঘটেছিল, যেহেতু কিছু লোক আবু বকরকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করেছে তাই মদীনায় মুসলমানদের অধিকাংশই তাকে মেনে নিয়েছে।

(২) এই প্রথা সম্পর্কে আলী খুব ভালোভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। তাহলে তিনি কেন 'আব্বাস এর কাছ থেকে বয়াত নেবার জন্য হাত না বাড়িয়েই বলে উঠলেন 'আমি ছাড়া আর কেই বা এমন আনুগত্য স্বীকারের কথা অন্যকে বলতে পারে?'– *(ইবনে কুতাইবাহঃ আল ইমামা ওয়াস সিয়াসা খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৪, আল মাওয়ারদিঃ আল আহ কামুস সালাতানিয়া পৃষ্ঠা ৭।)*

কারণ আলী জানাতেন, খিলাফাহ (খলিফাত্ব) বলতে কেবল গোত্র প্রধান হওয়া বোঝায় না। এটা জনগণের আনুগত্য স্বীকারের উপর ভিত্তি করে ঘটে না, এটা আল্লাহর দেয়া একটা দায়িত্ব, মানুষের দেয়া না। যেহেতু যিনি ইতিমধ্যেই আল্লাহর তরফ হতে নবীর মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইমামত প্রাপ্ত, সুতরাং জনগণের কাছে ঘুরে ঘুরে আনুগত্য আদায়ের তার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি চান না যে জনগণ ভাবুক যে ইমামত নির্ভর করে মানুষের দেয়া বায়াত এর উপর; যদি লোকেরা তার কাছে গাদির খুমের সেই ঘোষণার কারণে আসে তবে ভালো নতুবা ক্ষতিটা তাদেরই, তার নিজের নয়।

(৩) এবার আসুন আসা যাক সাকিফাহ এর ঘটনায়ঃ

মহানবীর জীবদ্দশায় নবীর মসজিদেই ছিলো ইসলামী যাবতীয় কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এখানেই যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হতো, দায়িত্বভার অর্পণ করা হতো, আয়াত শোনানো হতো এবং যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি হতো এবং যখন নবীর ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত মুসলিমরা সেই মসজিদে একত্রিত হলেন।

তাহলে কেনো সাদ ইবনে উবাদাহ এর বাহিনী মদীনার তিন মাইল বাইরে সাকিফাতে মিলিত হলেন যে জায়গায় আগের কোনো ভালো সুনাম নেই" এটা কি একারণে নয় যে তারা অন্য কারো আগেই খিলাফত্বকে দখল করতে চেয়েছিল এবং পরে সাদকে তাদের গৃহীত খলিফা হিসেবে দেখাতে চেয়েছিল।

গাদির খুমের ঘটনা এবং আরবের গোত্রের প্রথা মনে রাখলেই এর আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না।

(৪) যখন ওমর এবং আবু বকর ঘটনার কথা জানতে পারলেন তখন তারা মসজিদে। মুসলমানদের অধিকাংশও তখন মসজিদেই ছিলো। কেন তারা আর কাউকে ঐ জামায়াতটার কথা জানালেন না? কেন তারা আবু ওবায়দাকে সাথে করে নিয়ে চুপ করে বেরিয়ে এলেন? কারণ কি এটাই যে আলী এবং বনু হাশিম তখন মসজিদে এবং নবীর বাড়িতে উপস্থিত ছিলো এবং ওমর ও আবু বকর কাউকেই এই ঘটনার কথা জানাতে চাননি? অথবা কারণ ছিলো কি এটা যে তারা ভীত ছিলেন এই ভেবে যে যদি আলী সাকিফাতে এই জমায়েতের কথা জানতে পারে এবং যদি তিনি সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কারোরই সফল হবার পথ থাকবে না?

(৫) যখন আবু বকর আনসারদের কাছে নবীর বংশ থেকে আগত বলে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছিলেন তখন কি তিনি জানতেন না যে, আর করো এরচে' বেশী দাবী রয়েছে কারণ তারা নবীর পরিবারের সদস্য এবং একই রক্তমাংস থেকে আগত। যে ভণিতার কারণে আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ) এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তারা বৃক্ষ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। তার ফলটাকে (নবীর পরিবার) ধ্বংস করে।– *(আর রাদীঃ নাহজুল বালাগাহ (সুবী আস সালাহ'র সংস্করণ), বৈরুত পৃষ্ঠা ৯৮।)*

নিরাবেগভাবে ঘটনাকে বিচার করলে আমরা একে নির্বাচনও বলতে পারি না কারণ ভোটাররা (মুসলমানরা পুরো আরবে ছড়িয়ে ছিলো অন্ততঃ মদীনার মুসলমানরা) জানতোই না যে একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে, কোথায় বা কখন হচ্ছে, তার কথা না হয় বাদই গেলো। কিন্তু কিছু সুযোগ্য প্রার্থীও সাকিফাহ এর ঘটনার কথা জানতো না। তাহলে উপরের দু'টি কথা সম্পর্কে আমরা ইমাম আলী এর কথা স্মরণ করি।

তোমাদের দাবী যে তোমরা সকল মুসলমানের পরামর্শ নিয়ে এই কাজ করেছো, এটা কেমন পরামর্শ যেখানে পরামর্শদাতা অনুপস্থিত। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষকে (আনসার) বলেছ যে তোমরা নবীর গোত্রের ও আত্মীয়, তাহলে তোমার চেয়ে বেশী দাবীদার নিকট গোত্র ও আত্মীয়দের, কেননা তাদের রয়েছে রক্তমাংসের সম্পর্ক।– *(পুর্বোক্ত বাণী নং ১৯০; আত তাবারী [পৃষ্ঠা ৫০২–৩] লিপিবদ্ধ করেন– যার বাকি অংশটুকু হলো, আশ্চর্য সাহাবী হইলে খিলাফত পাওয়া যায় যেখানে সাহাবী ও আত্মীয়তা রক্তমাংসের সম্পর্ক আছে*

সেখানে খিলাফত পাওয়া যাবে না কেনো? আশ্চর্য বিষয় এই যে সুবি আস সালেহ এর সংস্করণ এবং মুফতি মোহাম্মদ আবদু তার সংস্করণ (বৈরুত ১৯৭৩ থেকে ইমাম আলী (আঃ)-এর বাণী ১৯০, পৃষ্ঠা ৫০২-৩ শেষ বাক্য (সাহাবী ও আত্মীয়) কথাটি বাদ দিয়েছে। দেখুন শরাহ নাহজুল বালাগাহ। ইবনে আবিল হাদীদ মোতাজেলী খন্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৪২৬, (কায়রো মিশর ১৯৫৯)।)

আবার আমরা একে মনোনয়নও বলতে পারি না কেননা, মহানবীর সাহাবীদের অধিকাশই এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আলী, আব্বাস, ওসমান, তালহা, জুবায়ের, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সালমান আল ফারীসী আবু জর গিফারী, আমর ইবনে ইয়াসীর, মিকদাদ, আবদুর রহমান ইবনে আওফ- তাদের কারোরই পরামর্শ নেয়া হয়নি এমনকি জানানো হয়নি।

এই খিলাফত্বের পক্ষে কেবল একথাটাই বলা চলে যে, "সাকিফাহ নীতিগত ব্যাপারটা যাই-ই হোক না কেন; যেহেতু আবু বকর কথায় জয়লাভ (কারণ সেটাই ছিলো গোত্রের প্রথা) করেছিলেন তাই ক্ষমতা রইলো তার হাতে, তিনি হলেন, সংবিধানগত খলিফা।"

আরো সরল ভাষায়, আবু বকর সংবিধানগত খলিফা হলেন কারণ তিনি ক্ষমতার বাক লড়াইয়ে জয়লাভ করেছিলেন। এভাবেই যে মুসলিমরা এই ঘটনাকে বড় করে দেখতে শিখলো তারা আগেভাগেই এও জেনে রাখলো গোণবার মতো ব্যাপার এই একটিই 'ক্ষমতা' একবার তুমি ক্ষমতার আসনে আসীন হলেই ব্যস সবকিছু ঠিকঠাক। তাহলেই তুমি হয়ে যাবে রাজ্যের 'সংবিধানগত' নেতা।

শেষে আমি ওমরের একটি কথা উদ্ধৃত করবো, যিনি ছিলেন এই খিলাফত্বের রচয়িতা। তিনি তার খিলাফত্বের সময় এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমি শুনেছি যে কেউ একজন বলেছে- "যখন ওমর মারা যাবে তখন আমি অমুকের কাছে আনুগত্য স্বীকার করবো।" কেউ কখনো এই ভুল পথে এই ভেবে চিন্তা করতে পারবে না যে আবু বকরের খিলাফত্ব ছিলো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার এটাও তাই হবে। অবশ্যই এটা বিস্মিত হবার মতো, কিন্তু আল্লাহ আমাদের অশুভ সবকিছুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন যদি কেউ একে অনুসরণ করার চেষ্টা করে তবে আমি তার গলা কেটে ফেলবো।- *(সহি বুখারীঃ আস সহীহ (কিবলাতুল মুহারিবীন) কায়রো, খন্ড-৮ পৃষ্ঠা ২১০; তাবারিঃ আত তারিকাহ খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৮২১।)*

২২. ওমরের মনোনয়ন

সুন্নীদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন যে সাকিফাতে যা ঘটেছিল তা হলো ইসলামের 'গণতান্ত্রিক আদর্শের বহিঃপ্রকাশ। সেই বিশ্বাসের সাপেক্ষে একটা 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন' সাকিফাহ এর অনুষঙ্গে এর অর্থ যাই হোক না কেন এটা ইসলামী খিলাফত্বের ভিত্তি হিসেবে চলে আসা উচিত ছিলো কিন্তু তা হয়নি।

আবু বকর তার নিজের খিলাফত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ওমরের কাছে ঋণী ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে জনগণকে যদি পছন্দের স্বাধীনতা দেয়া হয় তবে ওমর এর সুযোগ নেই (তিনি পরিচিত ছিলেন "রূঢ় এবং কর্কশ প্রকৃতির") সে কারণেই তিনি নিজের উত্তসূরীকে মনোনয়ন দানের সিদ্ধান্ত নেন যিনি হলেন ওমর। আত তাবারি লিখেছেনঃ 'আবু বকর যখন অন্তিম শয্যায় তিনি ওসমানকে ডেকে একটা নিয়োগপত্র লিখতে আদেশ দিলেন এবং তিনি বলে চললেন 'পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে এটা মুসলিমদের প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাহাফা এর নির্দেশ যে তারপর তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। ওসমান তখন এই ক'টি শব্দ যোগ করলেনঃ 'আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে তোমাদের আমার উত্তরসূরী হিসেবে মনোনীত করলাম।'

তারপর আবু বকর চেতনা ফিরে পেয়ে ওসমানকে তার হুকুমনামা পড়তে বললেন। ওসমান তা পড়লেন এবং আবু বকর বললেন, 'আল্লাহু আকবর।' তিনি খুশি হয়ে মন্তব্য করলেন, 'তোমরা বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলে যে আমি যদি এ অবস্থায় মারা যাই তাহলে লোকরা নিজেদের ভেতর মতৈক্যে আসবে না।' ওসমান উত্তর দিলেন, 'হাঁ', আবু বকর বললেন, ''আল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তোমাকে পুরস্কৃত করুন।" *(আত তাবারীঃ আত তারিখ পৃষ্ঠা ১২৩৮–৩৯।)*

এভাবেই নিয়োগপত্র সম্পূর্ণ হলো এবং আবু বকর সেটিকে মুসলমানদের সামনে পড়ে শোনানোর নির্দেশ দিলেন।

ইবনে আবদিল হাদিদ আল মুতাজেলী লিখেছেন যে, যখন আবু বকর চেতনা ফিরে পেলেন এবং লেখক যা লিখেছে তা পড়ে শোনালেন তখন আবু বকর ওমরের নাম শুনতে পেয়ে বললেন, 'তুমি কিভাবে এটা লিখলে?' ওসমান বললেন, আমি জানি আপনি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে

খলিফা বানাবেন না।' আবু বকর উত্তর দিলেন 'তুমি ঠিকই বলেছ।'– *(ইবনে আবীল হাদীদঃ শারহ খন্ড–১ পৃষ্ঠা ১৬৩–৬৫।)*

এর কিছুক্ষণ পরই আবু বকর মারা গেলেনঃ নিয়োগ পত্রের মাধ্যমে ওমর খিলাফত্ব পেলেন। এখানে আরেকটি ট্র্যাজেডীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যেটা ঘটেছিল নবীর ইন্তেকালের তিন কি পাঁচদিন আগে।

সহী মুসলিমে হযরত আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। নবীর ইন্তেকালের তিনদিন আগে ওমর ইবনে খাত্তাব এবং অন্যান্য সাহাবীরা তার পাশে ছিলেন। পয়গম্বর বললেন, 'আমাকে উইল এর মতো করে কিছু লিখে রেখে যেতে দাও, যেন তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ো।' ওমর বললেন, 'পয়গম্বর প্রলাপ বকছেন; আল্লাহর গ্রন্থই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' ওমরের কথা উপস্থিত সকলের মধ্যে উষ্মা ছড়ালো। কেউ কেউ বললেন যে, পয়গম্বরের আদেশ মানা উচিত যেন তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যা আশা করেন তাই লিখে যেতে পারেন। অন্যরা গেলেন ওমরের পক্ষে। যখন এই বিবাদ ও তর্ক উঁচুতে উঠলো মহানবী বললেন, 'তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে দূর হও'।– *(সহি মুসলিমঃ (কিতাবুল ওয়াসিয়াহ বাবুল তারিকিল ওয়াসিয়াহ) খন্ড–৫, পৃষ্ঠা ৭৫–৭৬; সহী বুখারীঃ আস সহীহ (কায়রো, ১৯৫৮) খন্ড–১, (কিতাবুল ইলম) পৃষ্ঠা ৩৮–৯; খন্ড–৪, পৃষ্ঠা ৮৫; খন্ড–৬, পৃষ্ঠা ১১–২; খন্ড–৭ (কিতাবুত তীব), পৃষ্ঠা ১৫৫–৫৬; খন্ড–৯, (কিতাবুল তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ) পৃষ্ঠা ১৩৭; এটা বেশ বিস্ময়কর যে বুখারী যেখানে মহানবীর প্রলাপ বকার উল্লেখ করেছেন সেখানে কথকের নাম দেননি; যেখানে তিনি একে নম্রভাষায় বলেছেন সেখানে স্পষ্টভাবে কথকের নাম লিখেছেন ওমর। –(ইবনে সাদঃ আত তাবাকাত খন্ড২–, পৃষ্ঠা ২৪২; ৩২৪, ৩৩৬, ৩৬৮; আহম্মাদঃ মাসনাদ খন্ড–১, পৃষ্ঠা ৩৩২, ৩৩৯, ৩২৪, ৩৩৬, ৩৫৫।)*

এখানে কুরআনের কিছু নির্দেশ উদ্ধৃত) করা হলো– ***হে ঈমানদারগণ! (কথা বলার সময়) তুমি নিজের কণ্ঠস্বর পয়গম্বরের কণ্ঠস্বরের উপরে তুলিও না এবং যেভাবে তোমরা একে অপরের সঙ্গে জোরে জোরে কথা বল উনার সম্মুখে সেভাবে কথা বলিও না, (এমন যেন না হয়) যাতে তোমার কৃতকর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং তুমি তা জানতেও পারবে না।*** সূরা হুজরাত–২।

মহানবীর বাণীগুলো ছিলো আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়াঃ *তিনি (নবী) নিজে ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। খোদার ওহি ব্যতীত।* সুরা নাজাম ৩-৪।

মুসলমানদের উচিত কোন প্রকার 'যদি'ও কিন্তু ছাড়াই তাঁর আদেশ পালন করাঃ -*এবং নবী যাহা দেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা থেকে বিরত রাখেন তাহা থেকে বিরত থাকো।* সুরা হাসর-৭।

এবং যে সময় মহানবী মৃত্যুর পাঁচদিন আগে মুসলিমদের বিপথে না যাবার জন্য শ্রুতিলিপি দিয়ে যেতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে তাকে অভিযুক্ত হতে হলো। 'প্রলাপ বকা'র দায়ে যখন আবু বকর, যিনি ঐশীভাবে ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত নন, একটি নিয়োগপত্রের শ্রুতিলিপি দিয়ে যেতে চাচ্ছেন অথচ তখন তিনি তার উত্তরসূরীর নাম বলার আগেই অচেতন হয়ে পড়লেন, ওমর তখন কিন্তু বললেন না যে তিনি প্রলাপ বকছেন।

কেউ জানে না যে মহানবী কি লিখে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার ব্যবহৃত বাক্য আমাদের একটা ধারণা দেয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহানবী ঘোষণা দিয়েছেন যে ' হে লোকেরা! আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান বস্তু রেখে গেলাম, আল্লাহর এর গ্রন্থ এবং আমার বংশধর, যারা আমার পরিবারের সদস্য। যতদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের ধরে রাখবে, আমার পরে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।

এই একই কথা তিনি ব্যবহার করেছেন তার ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে (........ আমাকে তোমরা উইলের মতো করে কিছু লিখে রেখে যেতে দাও যেন তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ো।") এটা সহজেই বোঝা যায় মহানবী লিখে রেখে যেতে চাচ্ছিলেন সেই কথা, যে কথা তিনি তাদেরকে এতদিন বলে এসেছেন কুরআন ও তার আহলে বায়াত (আঃ) সম্পর্কে।

সম্ভবতঃ ওমর কিছুটা ধারণা করেছিলেন, যেটা বোঝা যায় তার দাবী থেকেঃ ''আল্লাহর গ্রন্থই আমাদের জন্য যথেষ্ট"। তিনি নবীকে জানালেন যে, তিনি 'দুটি মূল্যবান জিনিষ'কে অনুসরণ করবেন না। একটিই তার জন্য যথেষ্ট।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এর সাথে একটি কথপোকথনে তিনি এটা স্বীকারও করেছেন। এতে তিনি বলেন, "এবং নিশ্চয়ই তিনি (নবী) তার অসুস্থতার সময় তার (আলীর) নাম ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন আর আমি

তাকে ঠেকিয়েছি।"– *ইবনে আবদীল হাদীদঃ শাহরহ খন্ড-১২, পৃষ্ঠা ২১ (আল খতিব আল বাগদাদী এর তারিখ বাগদাদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন)।*

সম্ভবতঃ 'নবী যদি শ্রুতিলিপি দিয়েও যেতেন তবুও প্রলাপ' শব্দটি তার কার্যকারিতা হারাতো না। ওমর ও তার দলবল দাবী করতেন যে এটা 'প্রলাপ লিখন'। এর কোনো যথার্থতা নেই।

২৩. আশ শুরাঃ নির্বাচকমন্ডলী

দশ বছর রাজ্য শাসন করার পর ওমর তার এক জরথুষ্টবাদী দাস, ফিরুজ এর দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হন।

ওমর ওসমানের কাছে ভালো রকমের ঋণী ছিলেন (ঐ নিয়োগপত্রের কারণে) কিন্তু তাকে প্রকাশ্যভাবে উত্তরসূরী হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে যাননি; আবার মুসলিমদের তার মৃত্যুর পর নিজেদের ইচ্ছায় নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়ে যাননি। তিনি বিচক্ষণতার সাথে তৃতীয় একটি উপায় উদ্ভাবন করে গেছেন।

তিনি বলেছেন, মহানবীর ইন্তেকালের সময় তিনি কুরাইশদের ছয়জনের উপর প্রীত ছিলেনঃ আলী, ওসমান, তালহা, জুবায়ের, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এবং আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটাকে (খলিফা নির্বাচন) তাদের সম্মিলিত মতের উপর ছেড়ে দিতে যেন তারা নিজেদের ভেতর থেকে কাউকে বেছে নিতে পারে।

তিনি যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে তখন তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা কররেন, "তাহলে তোমরা প্রত্যেকেই আমার মৃত্যুর পর খলিফাত হতে চাও", কেউ কোন উত্তর দিলেন না। তিনি পুনরায় প্রশ্নটি করলেন। তারপর জুবায়ের বললেন ''আমাদের অযোগ্যতার কি আছে? আপনি এটা (খেলাফাত্ব) পেয়েছিলেন এবং সম্পন্ন করেছিলেন; আমরা কুরাইশদের মধ্যে পরম্পরাক্রমে বা আত্মীয়তা সূত্রে (মহানবীর সাথে) আপনার চেয়ে কম নই।"

ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি তোমাদের সম্পর্কে কিছু বলবো না?" জুবায়ের উত্তর দিলেন, ""বলুন, কারণ আমরা যদি আপনাকে বলতে বারণও করি তবু আপনি তা শুনবেন না।" তখন ওমর একে একে জুবায়ের তালহা, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ এর চরিত্রের খারাপ দিকগুলো বর্ণনা করে যেতে লাগলেন।

তারপর তিনি ওসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে যাও। আমি যা দেখেছি তা হলো কুরাইশরা এই মালা (খেলাফাত্ব) কেবল তোমার ভালোবাসার কারণে পরে আছে; তারপর তুমি বনু উমাইয়া ও বনু আবু মুআইত (ওসমানের গোত্র) কে লোকদের ঘাড়ে বসাবে (শাসকরূপে) এবং তাদের ভেতর যুদ্ধলব্ধ মাল (মুসলিমদের) ভাগ করে দেবে; এভাবে তোমার কাছে একদল আরব নেকড়ে আসবে এবং তোমাকে তোমার শর্য্যাতেই জবাই করবে।

'আল্লাহর কসম যদি কুরাইশরা তোমার কাছে ক্ষমতা দিয়ে যায় তাহলে তুমি বনু উমাইয়ার কাছে সর্বোচ্চ সম্মান পাবে; আর যদি তুমি তাই করো তাহলে মুসলমানরা তোমাকে মেরে ফেলবে।' তারপর তিনি ওসমান এর কপাল চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'যদি তাই ঘটে তাহলে আমার কথা মনে রেখো।' কারণ এটা ঘটতে বাধ্য"।

তারপর ওমর আবু তালহা আল আনসারীকে ডেকে বললেন যে, তার কবর দেয়ার পর সে যেন আনসারদের ভেতর থেকে ৫০ জন লোক সংগ্রহ করে তাদের তরবারি সজ্জিত করে তারপর উপরোক্ত ছয়জনকে ডেকে তাদের ভেতর যে কোন একজনকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে বলে। যদি পাঁচ জন সম্মত হয় একজন অসম্মত হয় তার গর্দান নেবে, যদি চারজন সম্মত হয় দু'জন অসম্মত হয় তার গর্দান নেবে, যদি তিনজন অসম্মত হয় তবে যে দলে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থাকবে সেই দলের মত বহাল থাকবে যদি তাতে বাকি তিনজন সম্মত না হয় তবে তাদেরও গর্দান নেবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তারা সিদ্ধান্তে আসতে না পারে তবে প্রত্যেকেরই গর্দান নেবে এবং মুসলিমরা তখন যাকে খুশি খলিফা হিসেবে বেছে নেবে।"– *(পূর্বোক্তঃ খন্ড–১, পৃসা ১৮৫–৮৮; আরো দেখুন ইবনে কুতায়বাহঃ আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, খন্ড–১, পৃষ্ঠা ২৩–২৭; এবং আত তাবারী আত তারিখ (মিসর) খন্ড–৫, পৃষ্ঠা ৩৩–৪১।)*

শীয়া লেখক কুতবুদ্দিন আর রাওয়ানদি বর্ণনা করেন যে যখন ওমর আবদুর রহমান ইবনে আওফ এর দলের মতকে বহার থাকবে বলে ঘোষণা দিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তখন ইমাম (আঃ) কে বললেন, "এটি আবার আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। এই লোকটা ওসমানকেই খলিফা হিসেবে চাইবে।" ইমাম আলী (আঃ) উত্তর দিলেন, "আমিও সেটা জানি; তবু আমি তাদের সাথে সুরায় বসবো, কারণ ওমর এই সাজানো

ব্যবস্থা করে অন্ততঃ জনসমক্ষে এটুকু বলেছে যে, আমিই খিলাফাতের দাবীদার, অথচ এর আগে সে বলে এসেছে নুবুয়াত (নবীত্ব) এবং ইমামত একই পরিবার থেকে হতে পারে না। সে কারণে আমি সুরায় উপস্থিত থেকে তার কথা ও কাজের বৈপরীত্য লোকদের দেখিয়ে দেবো।"– *(ইবনে আবিল হাদীদঃ শারহ পৃষ্ঠা ১৮৯।)*

ইবনে আব্বাস ও ইমাম আলী (আঃ) নিশ্চিত হলেন যে, ওমর ওসমানকেই খলিফা রূপে চান? এর কারণ হলো শুরার সংবিধান ও এর আন্তঃসম্পর্ক।

আবদুর রহমান বিয়ে করেছিলেন ওসমানের ভগ্নিকে আর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুর রহমান ছিলেন চাচাত ভাই।

পারিবারিক বন্ধন আরবে যে প্রতিপত্তি পায় তা দেখে এটা অচিন্ত্যনীয় যে সাদ কি আবদুর রহমানের বিরোধিতা করবেন বা আবদুর রহমান ওসমানকে উপেক্ষা করে যাবেন না। সুতরাং ওসমান তিনটি ভোট পাবেনই, সাথে পাচ্ছেন আবদুর রহমানের কার্যকর ও জয়সূচক ভোটটি।

তালহা (ইবনে ওবায়দুল্লাহ) ছিলেন আবু বকরের গোত্রের এবং সাকিফাহ এর দিনটি থেকে বনু হাশিম ও বনু তাঈম পরস্পরের ঘোর শত্রু হয়ে যায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, ইমাম আলী (আঃ) তার চাচাকে হত্যা করেন; বদরের যুদ্ধে তিনি ওমর ইবনে ওসমান, তার ভাই মালি ইবনে ওবায়দুল্লাহ তার ভাগ্নে ওসমান ইবনে মালিককে হত্যা করেন। – *(আশ শাইখ আল মুফীদঃ আল ইরশাদ (লেখক মুহম্মদ বাকের সাঈদী খোরাসানীর ফারসী অনুবাদ সহ) পৃষ্ঠা ৬৫, আরো দেখুন আই, কে, এ হাওয়ার্ড এর ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৪৭।)* সুতরাং তারপক্ষে ইমাম আলী (আঃ)কে সমর্থন করা অসম্ভব। জুবায়ের হলেন ইমাম আলী (আঃ)–এর ফুপাত ভাই শাফিয়ার ছেলে। সাকিফাহর পর যারা আবু বকর এর কাছে ইমাম আলী (আঃ) কে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল তাদের সাথে লড়াই করতে তরবারি বের করেন। সুতরাং তাকে ইমাম আলী (আঃ)–এর পক্ষে ভাবাটাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। পক্ষান্তরে সে আবার নিজেও খলিফা পদ চাইতে পারে।

এভাবে দেখা যায় ইমাম আলী (আঃ) সর্বোচ্চ জুবায়েরকে তার পক্ষে ভাবতে পারেন। যদিও চারজন তার বিপক্ষে চলে গেছে এবং তাকে হারতেই হবে। যদি তালহা ইমাম আলী (আঃ) এর পক্ষ নেয় তবু সে

খলিফা হতে পারবে না। কারণ সমান সমানের ক্ষেত্রে আবুদর রহমানের দলের মতই বহাল থাকবে।- *এটা ইমাম আলী (আঃ)-এর ব্যাখ্যা, বর্ণনা করেছেন আত তাবারি তার আত তারিখে পৃষ্ঠা ৩৫ (উপরে ১৯ নং দ্রষ্টব্য দেখুন)। তদনুসারে এই সংলাপ ইমাম আলী (আঃ) ও তার চাচা আব্বাসের মাঝের।'*

এভাবে আন্তঃসম্পর্ক বিচার করলে দেখা যায় শুরায় যা ঘটবে তা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তালহা ওসমানের পক্ষ ত্যাগ করলো, জুবায়ের কে সে ইমাম আলী (আঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করতে বললো এবং সাদকে বললো আবদুর রহমান ইবনে আওফ এর পক্ষ ত্যাগ করতে।

তৃতীয় দিনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ নিজের নাম উঠিয়ে নিয়ে ইমাম আলী (আঃ)কে বললো যদি ১. তিনি আল্লাহর গ্রন্থ, ২. নবীর সুন্নাহ এবং ৩. আবু বকর ও ওমর এর পদ্ধতি মেনে চলেন তবে তাকে সে খলিফা বানাতে পারে। আবদুর রহমান খুব ভালো করেই জানতো যে এর জবাব কি হবে। ইমাম আলী (আঃ) বললেন, "আমি আল্লাহর গ্রন্থ, নবীর সুন্নাহ অনুসরণ করবো।"

তৃতীয়টিঃ সেটি (আবু বকর ও ওমরের সুন্নাহ) যদি কোরআন ও নবীর সুন্নাহর আলোতে হয়ে থাকে সেটা নতুন করে মানার প্রশ্নই আসে না। আর যদি তাহা কোরআন ও নবীর সুন্নাহর বহির্ভূত হয়ে থাকে তাহলেও এটাকে মানবো না।

এখানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে, মহানবী আল্লাহর হুকুমে মুসলমানদেরকে দু'টি জিনিস অনুসরণ করতে বলেছেন, আর আব্দুল রহমান ইমাম আলী (আঃ)কে তিনটি জিনিস অনুসরণ করতে বলেছিলেন।

এরপরই ঐ একই শর্তগুলো আবদুর রহমান ওসমানকে বললেন তিনি সাথে সাথেই তা গ্রহণ করলেন। (অবশ্য পরে তিনি শর্তগুলো কোনটাই মানেননি) এভাবে আবদুর রহমান ওসমানকে খলিফা নির্বাচিত করলেন। ইমাম আলী (আঃ) আবদুর রহমানকে বললেন, " খোদার কসম, যদিও তুমি এটা করলে না, কিন্তু একই আশা নিয়ে করলেন যা সে (ওমর) তার বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।" (তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, আবদুর রহমান এই আশা নিয়ে ওসমানকে খলিফা বানালেন, যেন ওসমান তাকে তার উত্তরসূরী হিসেবে নির্বাচিত করেন।) তারপর ইমাম আলী (আঃ) বললেন, "আল্লাহ যেন তোমাদের ভেতর শত্রুতা তৈরী করেন।" এর

কিছুদিন পর আবদুর রহমান ও ওসমানের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আবদুর রহমানের মৃত্যু পর্যন্ত তারা পরস্পর কথা বলেননি।

২৪. সামরিক ক্ষমতা

তৃতীয় খলিফা ওসমান যে সব মুসলিম তার স্বজনপ্রীতির কারণে সুখী হতে পারেনি তাদের হাতেই নিহত হন। পরিস্থিতি, তাকে তার উত্তরসূরী নির্বাচন করে রেখে যেতে দেয়নি। মুসলমানরা এই প্রথম স্বাধীনভাবে খলিফা নির্বাচনের সুযোগ পেলো। তারা তখন সবাই মিলে ইমাম আলী (আঃ)–এর দুয়ারে আসেন। কিন্তু নবীর ইন্তেকালের পরের এই পঁচিশ বছরে মুসলমানদের প্রকৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির কাছেও ইমাম আলী (আঃ)–এর শাসন (যা ছিলো পরম ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে, মহানবীর শাসন ব্যবস্থার মত) অসহনীয় ঠেকলো; তারা নিজেদের অনারব মুসলিমদের সমান হিসেবে দেখতে পারলো না। সুতরাং প্রথমে তালহা, জুবায়ের এবং আঈশা বিদ্রোহ করলো; তারপর মুআবিয়া গিয়ে দাঁড়ালো ইমাম আলী (আঃ)–এর বিপক্ষে। ইমাম আলী (আঃ)–এর শহীদ হবার পর ইমাম হাসান (আঃ) মুআবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তার লোকজন ইতিমধ্যে মুআবিয়ার উৎকোচ গ্রহন করেছিলো; তিনি যখন তার কয়েকজন সেনাপতিকে পাঠালেন মুআবিয়াকে বন্দী করে আনতে তখন তারা দলবদল করে শত্রুপক্ষে ভিড়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে ইমাম হাসান (আঃ) বাধ্য হলেন, মুআবিয়ার সাথে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে। এই চুক্তির পর, সুন্নীরা দাবী করেন যে, সামরিক ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে খিলাফত্ব লাভের একটা আইনসম্মত পথ।

এভাবেই খিলাফত্বের চারটি সাংবিধানিক পথ সৃষ্ট হলো।

২৫. সাধারণ আলোচনা

রাজনীতির ক্ষেত্রে, একটি দেশের সংবিধান আগেই তৈরী করা হয়। যখন সরকার নির্বাচনের বা আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় তখন প্রতিটি কর্মকান্ডই সেই সংবিধান মতে সম্পন্ন হয়। এর দ্বারা যাই ঘটুক না কেন সেটিই বহার ও বৈধ হিসেবে কার্যকর হয়; আর যা কিছু এর বিপক্ষে যায় তা পরিগণিত হয় অবৈধ ও অকার্যকর বলে।

যেহেতু সুন্নী মতাদর্শ অনুসারে উম্মাহর দায়িত্ব হলো খলিফা নিয়োগ করা সুতরাং এটা আল্লাহর এবং নবীর জন্য জরুরী ছিলো তাদের জন্য একটা সংবিধান প্রস্তুত করে যাওয়া (এ ধরনের খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে)। আর যদি তা না হয়ে থাকে তবে, মুসলমানদের উচিত ছিলো খলিফা নির্বাচনে আগে এমন একটা সংবিধান এর অনুমোদন করিয়ে নেয়া।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে সেটাও করা হয়নি এবং আমরা এখন একটা অদ্ভুত 'অস্তির সংবিধান' দেখতে পাচ্ছি যেখানে কাজ সংবিধানকে অনুসরণ করে না কারণ তাতে কিছু নেই বরং সংবিধানই পরিস্থিতিকে অনুসরণ করে।

সুন্নীরা তাদের দাবীর সমর্থনে বলেন যে, প্রথম যুগের মুসলমানরা খলিফার নিয়োগকে তাদের দায়িত্ব বলে ভাবতেন; এবং এত বড় দায়িত্ব বলে ভাবতেন যে তারা নবীর শেষকৃত্যে অংশ নেয়ার বদলে ছুটে গেছেন বনু সাঈদার সাকিফা হতে খিলাফতের এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে। এই ঘটনা থেকে তারা এই বলে উপসংহার টানেন যে, খলিফা নিয়োগের ব্যাপারটি উম্মাহরই দায়িত্ব।

কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে না যে, এই কি তাদের তথাকথিত 'নির্বাচন' এর কার্যকারিতা যাকে শীয়ারা চ্যালেঞ্জ করেছেন।

শীয়ারা দাবী করেন যে, এই ঘটনাটি অবৈধ। সুন্নীরা দাবী করেন যে এটি বৈধ কিভাবে সুন্নীরা তাদের দাবীকে যুক্তি ও প্রমাণের মত করে উপস্থাপিত করেন?

তারা এই বলে প্রমানের মত করে দাবী তোলেন যে, "আমার এই কাজ সঠিক কেননা আমি এটা করেছি"। কোন ন্যায় আদালত এই যুক্তি মানবে?

২৬. বাস্তব পরিস্থিতি

এইসব পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক দিকটি বাদ দিয়ে এবার দেখা যাক মুসলিম নেতৃত্ব ও ইসলামী মন-মানসিকতাকে এটা কিভাবে প্রভাবিত করে।

মহানবীর ইন্তেকালের ত্রিশ বছরের মধ্যে ক্ষমতা আরোহণের সকল উপায়ই ব্যবহৃত এবং সিদ্ধ বলে চালু হয়ে যায় নির্বাচন, মনোনয়ন,

সুপারিশ এবং সামরিক ক্ষমতা। এর যা ফল হলো, তা হচ্ছে আজকের দিনে প্রতিটি মুসলিম শাসক চান খলিফাহর আসন পেয়ে মুসলিমদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিতে; এটা হলো মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক ভ্রান্তি যা ছিলো এবং আজকেও তাই ঘটছে কেবলমাত্র মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে। প্রতিটি মুসলিম শাসক যে মুসলিম হিসেবে লিখে এসেছে যে, 'সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব' হলেও এর একটি সংবিধান সম্মত উপায়; সে সর্বদাই চায় অন্য মুসলিম শাসকদের দুর্বল করে ফেলে সে যেন মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান হতে পারে। এভাবে 'সংবিধান' পৃথিবীতে মুসলিমদের দুর্বল করে রেখেছে।

সে থেকেও সরে এসে, আসুন, আরো একবার দেখা যাক এই পদ্ধতিগুলো কি করে উদ্ভাবিত হবার সাথে সথেই চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হলো। খিলাফত্বের এই চার আইনের সীমানা এতটাই নিরাপত্তাহীন যে, যে কেউই এতে ঢুকতে পারে, তার জ্ঞান ও চরিত্র যেমনই হোক না কেন। মুআবিয়ার পর প্রথম খলিফা হয় তার ছেলে ইয়াজিদ। সে মুআবিয়ার দ্বারা মনোনীত এবং যার সামরিক শক্তি ছিলো কর্তাতীত। মুসলিমরা মুআবিয়ার জীবদ্দশাতেই তাদের বয়াত দিয়ে ছিলো এবং এর ফলে সেটা ইজমাও বটে। সুতরাং সে ছিলো'সংবিধান সম্মত খলিফা' কিন্তু তার চরিত্র ও বিশ্বাস কেমন ছিলো?

ইয়াজিদ এমন একজন যে নবীতে বিশ্বাস আনতে বলায় সে রূঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে তার বিশ্বাসকে পূর্বে উদ্ধৃত করা কবিতায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেঃ "বনু হাশিম রাজ্য পাবার জন্য কেবল একটা নাটক করলো মাত্র'; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বাণী (ওহী) বা উপলব্ধি কোনটাই এতে নেই। - প্রথম পর্বের ৯ নং দ্রষ্টব্য দেখুন।

সে শেষ বিচারের দিনটিকেও বিশ্বাস করতো না। 'হে আমার ভালোবাসার পাত্রগণ! আমার সাথে মৃত্যুরপর দেখা করবার আশা পরিত্যাগ করো কেননা তারা মৃত্যুর পর পুনরায় জাগরণের যে কথা বলেছে তা পুরান কাহিনী মাত্র যা আমাদের হৃদয়কে বাস্তব পৃথিবীর আনন্দ থেকে ভুলিয়ে রাখে।- *(সিয়ুতি ইবনে আল জাওজিঃ তাজকিরাহ পৃষ্ঠা ১৯১।)*

খিলাফত্ব পেয়ে সে ইসলামী এবাদত সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঠাট্টা করতে থাকে এবং মুসলিম মণীষীদের আলখাল্লা কুকুর ও বাঁদরের গায়ে পরিয়ে অবমননা করে। জুয়াখেলা ও ভল্লুকের সাথে খেলা, তার সময় কাটানোর

উপায়। আর তার সময় ব্যয় হতো মদ পানে; তাও আবার স্থানকাল ভুলে এবং যে কোন ধরনের দ্বিধা ছাড়াই। স্ত্রী লোকদের প্রতি তার কোন সম্মান ছিল না। এমনকি যারা নিষিদ্ধ তারাও যেমন সৎ–মা, বোন, চাচী বা কন্যা। তার কাছে ,তারা ছিলো অন্য যে কোন মেয়ে মানুষের মতোই।

সে মদীনায় তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মহানবীর পবিত্র এই শহর লুট করে নেয় তারা। স্ত্রী লোকদের বাদ দিয়েই প্রায় তিন শ' বালিকা অমানুষিকভাবে ধর্ষিত হয় তার সৈন্যদের দ্বারা। কোরআনের তিন শত ক্বারী (তেলাওয়াতকারী) এবং মহানবীর সাতশ সাহাবীকে নির্মমভাবে জবাই করা হয়। নবীর পবিত্র মসজিদ বহুদিনের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়; ইয়াজিদের সেনাবাহিনী একে আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করে। কুকুরদের আশ্রয় হয়ে যায় সেটা এবং মহানবীর ভাষণের যে উঁচু স্থান (মেম্বার) তাকে নোংরা করে ফেলা হয়।

শেষে, সেনাপ্রধান মদীনার লোকদের বাধ্য করে ইয়াজিদের প্রতি তাদের বয়াত দিতে, যার ভাষা ছিলো এমন 'আমরা ইয়াজিদের দাস; তিনি আমাদের যখন স্বাধীনতা দেবেন বা ক্রীতাদাসের ন্যায় বাজারে বিক্রি করবেন সব তার উপর।" যারা এই শর্তে রাজী হতে চেয়েছিল যে, ইয়াজিদ কুরআন এবং নবীর সুন্নাহ মেনে চলবে তাদের সবার মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। –(*আস সিয়ুতিঃ তারিখুল খুলাফা পৃষ্ঠা ২০৯ / মেজর এই এস জ্যারেট এর ১৯২; সিবত ইবনে আল জাওজীঃ তাজকিরাহ পৃষ্ঠা ২৮৮; মীর খাওযাদঃ রাওয়াতুস সাফা খন্ড–৩, পৃষ্ঠা ৬৬; ইবনে হাজার আল হাতিমীঃ আস সোয়ায়েকুল মুহরিকা পৃষ্ঠা ৭৯।)*
এখানে নিশ্চয়ই মহানবীর সেই বানীর উল্লেখ করলে ভুল হবে না যে তিনি বলেছিলেন "আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিন, যারা এই মদীনার লোকদের ভয় দেখায়।

তারপর ইয়াজিদের নির্দেশে সেনাবাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে থাকা সেই পবিত্র শহর। তারা শহরে ঢুকতে পারেনি তাই তারা মিনজানিক (গুলতিঃ এক প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ, যার দ্বারা ভারী পাথর দূরবর্তী লক্ষ্যসমূহে ছুঁড়ে মারা যায়।) এর দ্বারা তারা কাবার দিকে ভারী পাথর ও জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মারে। এতে কাবার কিশওয়াহ (কাবার কার্ণিশ) পুড়ে যায় এবং আংশিকভাবে ঘরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। – পূর্বোক্ত।

২৭. ওয়ালিদ এবং হারুণ–আর–রশিদ

কিন্তু এটা কোন ব্যতিক্রম ঘটনা নয়; এটা দুঃখজনকভাবে সাধারণ নিয়মকে প্রমাণ করে গেছে। ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আবদুর মালিক ছিলো বনু উমাইয়ার আরেক খলিফা। সে ছিলো ঘোর মদ্যপ। এক রাত্রে সে তার একজন কানিজ (বাঁদীর) এর সঙ্গে মদ্যপান করছিল এমতাবস্থায় সে ফজরের আজান শুনতে পায় সে তখন কসম খায় যে আজকে তার বাঁদী নামাজ পড়াবে, বাঁদী খলিফার পোষাক পরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়িয়ে আসে।

একদিন ওয়ালিদের কুদৃষ্টি তার কুমারী মেয়ের উপরে পড়ে সে তার মেয়েকে ধর্ষণ করে মুখে কালিমা লেপন করে, মেয়ের দাই সেখানে বসেছিল সে বলল, "এটা মাজুসির ধর্ম ইসলাম নয়" ওয়ালিদ তার উত্তরে বলল, 'যে মানুষের কথায় ভয় পায় সে দুঃখে মারা যায় সাহসী লোকরাই কেবল সকল আনন্দ পায়।"– *(আদ দিয়ার ইবনে বাকরীঃ তারিখুল খামিস (খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২০)। নওয়াব আহমাদ হুসাইন খান পয়ান ওয়ান যেভাবে তার তারিখ আহমাদী পৃষ্ঠা ৩২৮ এ উল্লেখ করেছেন/ ইবনে শাকরিঃ ফাওয়াতুর ওয়াফায়াত খন্ড–৪, পৃষ্ঠা ২৫৬–০৯)।*

এক হাজার এক রজনীর বিখ্যাত খলিফা হারুন অর–রশীদ যাকে খলিফাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়।

একদিন তার পিতার দাসীর সঙ্গে হীন উদ্দেশ্যে চারিতার্থ করতে চাইলে দাসী তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে তার বাবার সঙ্গে রাত্রি যাপন করে এসেছে সে তার সৎ মা হয়, তার সঙ্গে এমনটা করলে সেটা হবে ব্যভিচার "জিনা" তখন হারুন রশীদ কাজী আবু ইউসুফকে ডাকে এবং তাকে অনুরোধ করে একটা পথ খুঁজে বের করতে, যাতে সে সেই বাদীর সঙ্গে তার মনের বাসনা পূরন করতে পারে। কাজী ইউসুফ বলল সে একজন বাদী মাত্র, সে যাই বলবে আপনি খলিফা হয়ে সেটাকে সত্য বলে মেনে নেবেন? আপনি তার কথা মানতে বাধ্য নন। সুতরাং খলিফা সেই সৎ মা বাদীর সঙ্গে তার কামনা পূরন করলো। ইবনে মুবারক বলেন, আমি জানি না এই তিনজনের মধ্যে সবচে' বিস্ময়কর কে, যে খলিফা তার হাত মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ বিনষ্ট এবং সৎ মাকে সম্মান করে না, নাকি সেই বাঁদী যে খলিফার কামনা পূরণে অসম্মত হয়েছিলো, নাকি যে কাজী, খলিফাকে তার পিতার অবমানা করে তার বাঁদীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে বলেছিলেন। – পূর্বোক্ত।

২৮. আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা এবং আম্বীয়াদের পবিত্রতার বিশ্বাসের উপর খিলাফত্বের বৈপরিত্ব প্রভাব।

ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, খিলাফত বিষয়ে সুন্নি দৃষ্টিভঙ্গি, মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে এবং কিভাবে তাদেরকে এটিতে অভ্যস্ত করে দিয়েছে যে, সেই ব্যক্তির আনুগত্য করবে যে তার ক্ষমতা লাভের জন্য যে পথই অবলম্বন করুক না কেন সেটিই সঠিক। এক্ষেত্রে পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, খোদাভীরুতা এবং বিশ্বাসী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই; ক্ষমতা পাওয়াটাই বড়। হোক না সে অবিশ্বাসী, চরিত্রহীন, অকৃতজ্ঞ, করুণাবর্জিত, গুনাহ্গার। এই মনমানসিকতায় বিশ্বাসীগণ তাদের পূর্বের ধর্মবিশ্বাসকে বদলাতে বাধ্য করেছে যে, শুধুমাত্র খলিফারা কেন, আম্বীয়ারাও পর্যন্ত গুনাহ্ করে ফেলেছেন। এভাবেই তারা আম্বীয়াদের পবিত্রতার বিশ্বাস পর্যন্তকেও বদলিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমতঃ দেখা গেছে প্রতিটি যুগে হাজারো শিক্ষিত, জ্ঞানী, গুণী, খোদাভীরু, চরিত্রবান ব্যক্তি থাকতে অল্পশিক্ষিত, অবিশ্বাসী, চরিত্রহীন, করুণা বর্জিত ব্যক্তিকে খলিফা বানাতো। তাদের কথা হল এতে দোষণীয় কিছু নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শীয়াদের বক্তব্য একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকতে একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমতা বা মর্যাদা দেয়া ঠিক না। কিন্তু জ্ঞানহীনভাবে সুন্নিদের ঘোষণা, 'ভাল বা মন্দে বান্দার কোন হাত নেই। সবই আল্লাহর হুকুমে হয়।'

আহলে সুন্নাত খেলাফতের ব্যাপারে যে জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে মূল ধর্ম বিশ্বাসকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এখানে তা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়, যা করা হয়েছে আপাততঃ যথেষ্ট।

ইহা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, খলিফাদের রক্ষা করতে যেয়ে শুধু আম্বীয়াদেরকেই পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়নি, আল্লাহকেও তার ন্যায়পরায়ণতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এখন সেই অস্থিতিকর যুগের অবসান হয়েছে। এই তুলনামূলক স্থিতিশীল অবস্থায় ঐ অস্থিতিকর যুগের বিচার বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে আমরা খুব সহজে গাদির খুমে নাজিল হওয়া আয়াতের অর্থের গভীরতা থেকে তার আসল উদ্দেশে পৌছাতে পারবোঃ

*হে রাসুল! পৌঁছিয়ে দিন (বাণী) যাহা আপনার রব হইতে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে, আর যদি ইহা পৌঁছিয়ে না দেন তাহা হইলে মনে করা হইবে যে, আপনি রেসালাতের কোন কাজই সমাধা করেন নাই এবং আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের (দুষ্টদের) নিকট হইতে রক্ষা করিবেন..... /*সূরা মায়েদাঃ ৬৭।

ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মকান্ডে শুদ্ধতা নির্ভর করে ইমাম আলী (আঃ)–এর খিলাফত্বের উপর; যদি সেই একটি ঘোষণা (ওহী) পরিবেশিত না হয় তবে এমন হবে যে কোন ঘোষণাই (ওহী) পরিবেশিত হয়নি। সুতরাং পুরো ধর্মের নিরাপত্তা। নির্ভর করছে পবিত্র নবীর পর ইমাম আলী (আঃ)'র খিলাফত্বের উপর।

২৯. শীয়া মতবাদ কি অগণতান্ত্রিক?

আমাদের বিপরীত পক্ষ প্রথম চার খলিফা ও আমাদের বার ইমামদের পরম্পরা লক্ষ্য করেই দাবী করেন যে শীয়া মতবাদ অগণতান্ত্রিক। বার জন খলিফার প্রত্যেকেই এসেছেন একটি পরিবার থেকে যেখানে প্রথম চারজন খলিফাই এসেছেন চারটি পৃথক গোত্র থেকে। উপসংহারে তারা আরো বলেন, সুন্নী চিন্তাচেতনার ক্ষেত্র আদর্শগতভাবে অনেক গণতান্ত্রিক এবং যেটা শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম। আর শীয়া মতবাদ, তাদের মতানুসারে, বংশগত শাসন চায় বলে তা ভালো পদ্ধতি নয়।

প্রথমতঃ কোন সরকার পদ্ধতিই নিজে ভালো বা খারাপ কোনোটাই নয়। এটা ভালো বা খারাপ হয়ে পড়ে সেই লোকটির সাপেক্ষে যে একে নিজ হাতে ধরে রাখে। তদনুসারে, শীয়াদের বিশ্বাস হলো একজন ইমাম হবেন মাসুম, সকল খুত ও দোষ থেকে মুক্ত, গুণাবলীর দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তার শাসন হবে সবচে' সঠিক এবং ন্যায়পরায়ণ প্রথম ইমাম আলী (আঃ)–এর ইমামত এর ক্ষুদ্র সময়ে তার আপোষহীন ন্যায়পরায়ণ ছিলো দৃষ্টান্তমূলক; অপর পক্ষে নবীর গৃহীত হাদীস মতে শেষ ইমাম আল মাহদী হবেন "তিনি নির্যাতন আর অন্যায়ে ভরা পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণ ও সমতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন।" – *(আবু দাউদঃ আস সুনান খন্ড–৪, পৃষ্ঠা ১০৬–০৯; আহমাদঃ আল মাসনাদ খন্ড–১, পৃষ্ঠা ৩৭৭, ৪৩০; খন্ড–৩, পৃষ্ঠা ২৮; আল হাকীমঃ আল মুস্তাদারাক পৃষ্ঠা ৫৫৭, ৮৬৫।)* আমাদের প্রতিজ্ঞা, সুতরাং বিমূর্ত কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল সুন্নী খলিফা, আবু বকর হতে শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাসীম বিল্লাহ (হালাকু খান কর্তৃক ৬৫৬/১২৫৮ তে নিহত) পর্যন্ত প্রত্যেকে ছিলো কুরাইশ। এর অর্থ কি এই নয় যে, একই পরিবার পূর্ব চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত মুসল্মানদের উপর সাড়ে ছয় শতাব্দী রাজত্ব চালিয়েছে।

তৃতীয়তঃ খিলাফত্বে সুন্নী পদ্ধতি আগেই বলা হয়েছে, কখনোই গণতন্ত্রভিত্তিক নয়। প্রথম খলিফা মদীনার মুসলিমদের উপর হাতে গোণা কয়জন সাহাবীর মতের ভিত্তিতে অভিষিক্ত হন; দ্বিতীয়জন মনোনীত হন প্রথমজনের দ্বারা; তৃতীয় জন পাঁচ জনের মনোনয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন যদিও বাস্তবে তা মাত্র একজনেরই ছিলো। মুয়াবিয়া সামরিক ক্ষমতার ফলে খিলাফত্ব পায়। এর আগে সেটা ছিলো খুব বেশী হলে গোত্র শাসন; তারপরে সেটা হয়ে পড়ে রাজত্ব।

গণতন্ত্রের জন্য এভাবে সাংবিধানিক নীতিগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। সমতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে দেখলে দেখতে পাই ইসলামের একেবারে প্রাথমিক সরকারগুলো কি ধরনের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। ওমর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, একজন অনারব কখনোই একজন আরবের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পেতে পারেন না যদি না সেই উত্তরাধিকারীর জন্মস্থান আরব হয়। –*(ইমাম মালিক ঃ আল মুয়াত্তা খন্ড–২, পৃষ্ঠা ৬০।)* আবার একেবারে প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ অংশেই সুন্নী আইন একজন অনারব পুরুষকে আরব রমণী বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলো। অথবা একজন অকুরাইশ বা অহাশেমী পুরুষ একজন কুরাইশ বা হাশিমী রমণীকে বিবাহ করতে পারতো না। শাফিয়ী আইন মতেও, একজন সে যদি মুক্তও হয় তবু সে একজন মুক্ত মেয়ে মানুষকে বিবাহ করতে পারবে না।–*(আল জাজিরিঃ আল ফিকাআলাল মাদহাহীবী বিল আরবাহ খন্ড–৪, পৃষ্ঠা ৬০।* এটা ঘটেছিল নবীর সেই স্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেওঃ " কোন আরবের জন্য অনারবের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই; অনারবেরও শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরবদের উপর একজন সাদা মানুষেরও নেই কালোদের উপর কিংবা কালোদেরও নেই সাদাদের উপর, কেবল করুণা ছাড়া। মানুষ আদম হতে এসেছ এবং আদম এসেছেন মাটি হতে।"– *(সিয়ুতিঃ দুর্রে মানসুর খন্ড–৬, পৃষ্ঠা ৯৮।)*

নবীর এই ঘোষণা আগেই তিনি তার চাচাতো বোনকে জায়েদ ইবনে হারিয়াহ নামের এক মুক্ত ক্রীতদাসের সাথে বিবাহ দেন এবং আবদুর

রহমান ইবনে আওফ (একজন কুরাইশ) এর বোনের সাথে একজন মুক্ত ইথুপিয়ান ক্রীতদাস বিলাল এর বিবাহ দেন।- *(ইবনুল কায়িমঃ জাদুল মা'দ খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ২২।)*

শীয়া শরীয়াহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, " একজন ক্রীতদাসের পক্ষে একজন মুক্ত মেয়ে মানুষ বিবাহ করা বৈধ, আরব রমনীর পক্ষে অনারব, একজন হাশিমী স্ত্রীলোকের পক্ষে একজন অহাশিমী এবং বিপরীত ক্রমে। এভাবে একজন বিদুষী, সম্পাদশালী স্ত্রী লোককে বিবাহ করা একজন ক্ষুদ্র জ্ঞান ধনসম্পত্তির লোক বা নিম্নপেশার লোকের পক্ষে বৈধ।"- *(আল মুহাক্কিক অর হিল্লীঃ শারাইয়ুল ইসলা (কিতাবুল নিকাহ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা ৩০০; আল হাকিমঃ মিনহাজুস সালেহীন (কিতাবুল নিকাহ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২৭৯।)*

যুদ্ধলব্ধ মালামাল বন্টনের ক্ষেত্রে মহানবী একটা সমতার ব্যবস্থা স্থাপন করে গেছেন; এটা সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে। আবু বকর এই ব্যবস্থা পালন করেন কিন্তু ওমর ১৫ হিজরীতে নবীর ইন্তেকালের মাত্র চার বছর পর এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের জন্য বার্ষিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে যানঃ নবীর চাচা আব্বাসের বরাদ্দ ছিলো বছরে ১২০০০ বা ২৫০০০ দিনার; আয়শার ১২০০০; নবীর অন্যান্য স্ত্রীদের জন্য প্রত্যেকে ১০,০০০; বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে ৫০০০; যারা বদর ও হুদাইবিয়ার মাঝখানে যোগ দিয়েছে তদের প্রত্যেকে ৪০০০ করে; যারা হুদাইবিয়ার পরে ও কাদিয়সিয়ার আগে যোগ দিয়েছে তাদের প্রত্যেকে ৩০০০; এভাবে অংকে কমতে কমতে শেষে হয়েছে বছরে দুই দিনার।- *(আত তাবারিঃ আত তারিখ (বর্ষপঞ্জী ১) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা ২৪১১-৪; Nicholson, R.A. : A Literary History of the Arabs পৃষ্ঠা ১৮৭।*

এই ব্যবস্থা মুসলিম জাতিকে এমন একটা পর্যায়ে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলে যে তাদের জীবনের লক্ষ্য এবং ধর্মের অন্যতম লোভ হয়ে দাঁড়ায় সম্পদ। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও হয়ে পড়ে বস্তুবাদী এবং আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সমবন্টনের পদ্ধতিকে তারা সহ্য কতে পারেনি যা ইমাম আলী (আঃ) তার খিলাফত্ব গ্রহণের পর দেয়া প্রথম ভাষণে বলেছিলেনঃ

মুহাজিরান এবং আনসারদের ভেতরকার কোন সাহাবী যদি ভাবেন যে তিনি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার এই সাহাবীত্বের কারণে (তাকে তাই ভাবতে দেয়া হোক) তার জানা উচিত যে, উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠত্ব কাল আল্লাহর

সামনে নির্ধারিত হবে এর পুরস্কার বা বৃত্তি সব আল্লাহর কাছে কেউ এর পুরস্কার পৃথিবীতে আশা করতে পারেন না। যে লোক আল্লাহ এবং তার নবীর ডাকে সাড়া দিয়েছেন- তিনিই আমাদের এই ধর্মের সত্য গ্রহণ করে এর ভেতর প্রবেশ করেছেন এবং কিবলা এর দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। ইসলামের সকল ক্ষেত্রেই তার অধিকার রয়েছে এবং তিনি ইসলাম দ্বারা সীমাবদ্ধ। আপনারা সবই আল্লাহর দাস; এটা আপনাদের সবার ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য কারো চেয়ে কারো কোন অগ্রাধিকার নেই.....।- *(ইবনে আবিল হাদীদঃ শারহ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৭; আরো দেখুন আল ইমাম আলীর অভিভাষণ নং ১২৬, নাহজুল বালাগা।)*

যারা ইমাম আলী (আঃ)-এর খিলাফত্ব লাভের বিশ বছর আগে অসম বন্টনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে, তারা ইমাম আলী (আঃ)কে আপোষের প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু তিনি যখন দেখিয়েছেন ইসলামী আদর্শ অনড় তখন তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

উমাইয়াদের বিজরে পর মুসলিমদের মধ্যে এই অসমতা আরো বহু দূর পর্যন্ত গড়ায়। যদি কেউ তখন ইসলাম গ্রহণ করেও থাকে তবু সে মুসলিম অধিকার এর আওতাভুক্ত বলে গণ্য হতো না। অনেক ক্ষেত্রে তদের অবস্থা তাদের স্বদেশবাসী অমুসলিমদের চেয়েও জঘন্য হয়ে পড়লো পরের ক্ষেত্রে ওদেরকে জিজিয়া দিতে হতো কিন্তু মুসলমানদের সেটা এবং যাকাত (মুসলিমদের দেয়া খাজনা) দুটোই দিতে হতো। উমাইয়া রাজত্বের সময় (ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এর শাসনকালের আড়াই বছর বাদে) জিজিয়া কর সকল আরব এমনকি মুসলমানদের সহ মাফ করে দেয়া হয়।- *(আত তাবারীঃ আত তারিখ (বর্ষপঞ্জী-২, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১৩৫৪, ১৩৬৭।)*

কল্পনা করা কঠিন নয় যে এই নীতি ইসলামে কতটা সাহায্য করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী যার শহর ও রাজধানী ছিলো 'ইসলামী' তারা পরিবর্তন প্রত্যাখ্যান করলো। এমনকি বর্বররা (যারা আরবদের অভিযানের ক্ষুদ্র প্রতিরোধের পর সম্মত হয়েছে এবং স্পেনে এবং ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে কাজ করে গেছে) একত্রিতভাবে পরিবর্তিত হলো না আল মাগরিবে প্রথম শীয়া রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত। যখন ইদ্রিস ইবনে আবদুল্লাহ, আল ইমাম হাসান এর প্রপৌত্র এবং ইদ্রিস বংশের প্রতিষ্ঠাতা (৭৮৯-৯৮৫ খ্রীঃ) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তাদের অধিকাংশই ছিলো অমুসলিম। একেবারে শুরুর এমন অন্যায় [illegible]বের এই ছিলো ফলাফল।

আমরা শুনি যে, যখন আবদুল মালেক উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করে ইয়াজিদ ইবনে আবি মুসলিম দিনারকে আল মাগরিবে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় জন পুনরায় জিজিয়া কর চালু করেন তাদের উপরে যারা সদ্য মুসলমান হয়েছে এবং তাদের নির্দেশ দেয় ধর্মান্তরিত হবার আগে যে গ্রামে ছিলো সেখানে ফিরে যেতে।–*(আল আমিনঃ ইসলামী শীয়া বিশ্বকোষ খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৩৮-৪১।)*

ইদ্রিসরা এই নীতি পরিবর্তন করে সকল মুসলমানের জন্য ইসলামী নীতি স্থাপন করে এবং বর্বরদের ধর্মান্তিরত করে।

আরবদের উচ্চ প্রশংসা করার প্রবণতা একেবারে প্রাথমিক মুসলিম শাসকদের ভেতের গভীরভাবে প্রোথিত দেখা যায়। যদি বিজিত দেশের কোনো প্রজা ইসলাম গ্রহণ করে তো তাকে তখন মুসলিম বলে গ্রহণ করা হতো না যতক্ষণ না সে নিজেকে কোন আরব গ্রোত্রের খদ্দের রূপে সম্পৃক্ত না করছে। এমন ধরণের খদ্দেরদের বলা হতো মাওয়ালি। তখনও তাদের থাকতে হতো অস্পষ্টতা ও অসম ব্যবহারের ভেতর। অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের এই ব্যবহার এবং একই সাথে বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষন চলতো তাদের উপর।

১২ জন ভ্রান্তহীন ইমামের আইনের অধিকারের মাধ্যমে আল্লাহ দাঙ্গা, ঝগড়া, বিশৃংখলা বা প্রহসনের ভোটের মূল কেটে দিয়েছেন আর সাথে বন্ধ করেছেন সামাজিক ও গোত্রীয় অসমতাকেও।

৩০. একটি রাজ বংশীয় আইন?

অনেকে বলেন, শীয়াগণের বিশ্বাস যে, মহানবী তাঁর পরিবার থেকে একটা বংশীয় শাসন শুরু করতে চেয়েছিলেন। (যদি এটাকে মেনেও নেওয়া যায় তবে তাতে তিনি অবশ্যই ব্যর্থ হয়েছেন)।

তারা যুক্তি দেয় যে, যেহেতু মহানবী এই সর্ব স্বার্থপর লোভের অনেক উর্ধ্বে সুতরাং শীয়া বিশ্বাসীদের ধারণা ভুল। কিন্তু আবার এই লোকেরাই বলে যে, মহানবী বলেছেন..... " ইমামরা হবেন কুরাইশ বংশ থেকে।" তখন কি তারা বলবেন যে মহানবী তার গোত্রের জন্য একটা রাজত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিলেন? তারা কি বলবেন যে মহানবী এই শব্দগুলো বলেছেন স্বার্থপর লোভের বশবর্তী হয়ে?

আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে আবু বকর মদীনার আনসারদের এই বলে শান্ত করেছিলেন যে মহানবী হলেন কুরাইশ বংশদ্ভুত এবং আরবরা তাদের উপরে খলিফা হিসেবে কখনোই একজন অকুরাইশীকে মেনে নেবে না। এই যুক্তি আনসারদের শান্ত করে রেখেছিল।

যদি এই যুক্তির আলোকে মহানবীর পরিবারের কাউকে খলিফা নির্বাচন করা হয় (যেমন ইমাম আলী (আঃ) তাহলে সবাই তাকে মানবে এবং কোন ধরণের দাঙ্গা বা জটিলতা দেখা দেবে না। ইমাম আলীর এই নিয়োগকে অনেক অমুসলিম লেখকও সমর্থন করেন। জনাব সেডিলো লিখেছেন, "যদি বংশ পরম্পরাকে মানা হতো (ইমাম আলী (আঃ)–এর পক্ষ) তাহলে এইসব ভয়ংকর দাবী উঠতো না, যার ফলে মুসলমানদের রক্ত ইসলামকে গ্রাস করতে এসেছে......মা ফাতিমা (আঃ)–এর স্বামীটিই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মহানবীর একজন যোগ্য আইনসম্মত উত্তরসূরী হবার যোগ্যতা রাখেন এবং সাথে সাথে নির্বাচিত হবারও।"– *(সেডিলো, এল পি, ই এ, Historire des Arabes (আরবী অনুঃ) পৃষ্ঠা ১২৬–২৭)।*

যারা অভিযোগ তোলেন তারা আসলে এসব দিক ভুলে যান। শীয়ারা কখনোই দাবী করেনি যে, 'ইমামত' এর সাথে 'উত্তরাধিকার সূত্রের কোন যোগাযোগ আছে। আগে যেমনটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে একজন ইমামকে হতে হবে মাসুম, গুণাবলীর দিক থেকে উম্মাহর ভেতর হতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং হতে হবে মিনসুস মিন আল্লাহ (আল্লাহর তরফ হতে মনোনীত)। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমা যে, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং মহানবী' একই পরিবার হতেই এসেছিলেন। বাস্তবে এবং কার্যত সকল ইমামঃএসেছেন; আর যারা ইমামতের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ধারণ করে তারা সকলে ছিলেন অবশ্যই মাসুম।

ওয়া সালামো আলা মান আত্তবাউল হুদা

আল্লাহর হেদায়েত ও সালামতি তাদের জন্য যারা ইমামদের এত্তেবা করে।

গ্রন্থপঞ্জি

আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আল-আসা'ত আল-আজদি আস-সাজিসতানী (২০২ হিঃ/৮১৭-২৭৫ হিঃ/৮৮৯)ঃ আস-সুনান, কায়রো।

আবুল ফিদা, ইমাদুদীন, ইসমাঈল ইবনে 'আলী ইবনে মাহমুদ আল-আয়ুবি (৬৭২ হিঃ/১২৭৩-৭৩২ হিঃ/১৩৩৮)ঃ আত-তারিখ (আল-মুখতাসার ফি আখ'বারী আল বাসার) বৈরুত।

আহ্‌মেদ, আবু আবদল্লাহ্‌, আহ্‌মেদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামবাল (১৬৪ হিঃ/৭৮০-২৪১ হিঃ/৮৫৫)ঃ আল-মাসনাদ, কায়রো, ১৩১৩

আলী মুহাম্মদ এবং আমীরুদ্দীন, ফুলকুন-নাজাত ফি-ইলি-মামাতি ওয়াস সালাত, লাহোর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫০

আল-আল্লামাহ হিল্লী, আবু মানসুর, আল হাসান ইবনে ইউসুফ ইবনে 'আলী ইবনে আল মুতাহার আল-আসাদি (৬৪৮ হিঃ/১২৫০-৭২৬ হিঃ/১৩২৫)ঃ আল বাবুল হাদী আশার, Eng. tr. W.M. Miller, Lauzac &., London, ১৯৮৫।

আল-আমীন, হাসান; Islamic Shi'ite Encyclopaedia, বৈরুত।

আল-আমীনী, আস-সায়েখ; আবুল হুসাইন ইবনে আহ্‌মেদ আত-তাবরিজি, আন-নাসাফি (১৩২০ হিঃ/১৯০২-১৩৯০ হিঃ/ ১৯৭০) আল-গাদীর, ৩য় সংস্করন, বৈরুত, ১৩৮৭ হিঃ ১৯৬৭।

আমৃতসারী, ওবায়দুল্লাহ্‌; আরজাহুল মাতালিব, লাহোর, ১৩১৮ হিঃ।

আল-আয়াসি, আবু আন নাদর, মুহাম্মদ ইবনে মাসুদ সুলামী আস-সামারকানদীঃ আত-তাফসির, তেহ্‌রান।

আল্‌ বাগ্‌হায়ী, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনে মা'সুদ আস-শাফিয়ী (৪৩৬ হিঃ/১০৪৪-৫১০ হিঃ/১১১৭)ঃ আত-তাফসির (মা-আলিমুত্‌ তানজিল), আল্‌ খাজিন এর শিরনামে আত-তাফসির, কায়রো, ১৩৭৫ হিঃ/১৯৫৫।

আল্‌-বায়হাকী, আবু বকর, আহমেদ, ইবনে আল-হুসাইন আন নেসাবুরী আস শাফিয়ী (৩৮৪ হিঃ/৯৯৪-৪৫৮ হিঃ/১০৬৬)ঃ জালালুন-নবুওয়াহ্‌, কায়রো, ১৩৮৯ হিঃ/১৯৬৯।

আল-বুখারী, আবু আবদিল্লাহ্‌, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ১৯৪ হিঃ/৮১০-২৫৬ হিঃ/৮৭০)ঃ সহী, কায়রো।

CARLYLE, T.: On Heroes, Hero -Worship and The Heroic in History, Edinburgh edition.

DAVENPORT. J.; An Apology for Mohammed and the Koran, লন্ডন, ১৮৬৯।

আদ–দায়ার বাকরী, হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আস–শাফিয়ী (৯৬৬ হিঃ/১৫৫৯)ঃ তারিখুল–খামীস, কায়রো, ১২৮৩ হিঃ।

ফাইদ আর–কাশানী, মুহাম্মদ মুহ্সিন (১০১০ হিঃ/১৫৯৯- তেহরান, ১৩৭৪ হিঃ/১০৯৪ হিঃ/১৬৯০) আত তাফসির (আস শাফায়ী) তেহরান।

আল–গানজি; আবু আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস–নাযাফী (মৃত্যু ৬৫৮ হিঃ/১২৬০)ঃ কিফাইয়াতুত তালিব (ফী মানাকিব 'আলী ইবনে আবুতালিব), আন নাযাফ আল আশরাফ (ইরাক) ১৯৩৭।

আল–গাজ্জালী, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আততুসী আস শাফিয়ী (৪৫০ হিঃ/১০৫৮–৫০৫ হিঃ/১১১১)ঃ এহিইয়া–উলুমুদ্দিন, বৈরুত, ১৯৭৫।

গিয়াসুদ্দীন; মুহাম্মদ ইবনে জালালউদ্দীন রামপুরী (১৩শ হিঃ/১৯ শতাব্দী) গিয়াসুল লুঘাত, নাওয়াল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্মনৌ, ১৮৬৭।

GIBBON, E.: The Decline and Fall of the Roman Empire, The modern Library, New York.

আল–হাকিম; আবু আবদুল্লাহ্, ইবনুল বায়াই, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল–নাইসাবুরী আস শাফিয়ী (৩২১ হিঃ/৯৩৩–৪০৫ হিঃ/১০১৪) ঃ আল্–মুসতাদারাক (আলাস সহী) হায়দারাবাদ, ১৩৩৫ হিঃ।

আল হাকিম, আস- সৈয়দ মুহ্সিন আত–তাবাতাবাই (১৩০৬ হিঃ/১৮৮৯–১৩৯০ হিঃ/১৯৭০)ঃ মিনহাযুস সালেহিন, দারুজ–জাহ্রা, বৈরুত, ১০ম সংস্করণ।

আল–হাম্মুইয়ী, আবু ইসহাক, ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ আল জুয়াইনী (৬৪৪ হিঃ/১২৪৬–৭৪২ হিঃ/১৩২২)ঃ ফারাইদুস, সিমতায়ীন, বৈরুত ৯২য় খন্ড), ১৯৭৮।

ইবনে আবদিল বার্, আবু ওমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল কুরতুবি আল মালিকী (৩৬৮ হিঃ/৯৭৮–৪৬৩ হিঃ/১০৭১)ঃ আল্ ইসতিয়াব ফী মারিফাতিল- আসহাব, কায়রো, (৪র্থ খন্ড), ১৩৮০ হিঃ/১৯৬০।

ইবনে আবিল–হাদিদ, ইজ্জুদীন আবদুল হামিদ (৫৮৬ হিঃ/১১৯০–৬৫৫ হিঃ/১২৫৭)ঃ সারাহ্ নাহ্জু'ল বালাগাহ্, মিসর, ২য় সংস্করণ, (২০ম খন্ড)।

ইবনুল আসির, আবুল হাসান, ইজ্জুদ্দীন, আলী ইবনে মুহাম্মদ আল জাযরী আস্ শাফী (৫৫৫ হিঃ/১১৬০–৬৩০ হিঃ/১২৩৩)ঃ আল কামিল (ফিত তারীখ), বৈরুত, ১৩৮৫ হিঃ/১৯৬৫, উসদুল–গাবাহ্, কায়রো, ১২৮৫ হিঃ।

ইবনে হাজার আল–আসকালানী, সিহাবুদ্দীন, আবুল ফিদা, আহমেদ ইবনে 'আলী আস শাফী (৭৭৩ হিঃ/১৩৭২–৮৫২ হিঃ/১৪৪৯)ঃ ফাতহুল বারী (ফী সারাহ্ সহী আল বুখারী), কায়রো, ১৩৭৮ হিঃ।

ইবনে হাজার আল হায়তামী, আবু আল আব্বাস, আহমেদ ইবনে মুহাম্মদ আল মাক্কী আস সাফী (৯০৯ হিঃ/১৫০৩–৯৭৩ হিঃ/১৫৬৬) আস সাওয়াইকে আল মুহ্‌রিকাহ্।

ইবনে হিশাম, আবু মাহাম্মাদ 'আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম আল বাকরী (২১৩ হিঃ/৮২৮) আস সীরাহ্ আন নাবাইয়াহ্, কায়রো।

ইবনে কাসির, আবুল আল ফিদা, ইসমাঈল ইবনে ওমর আদদিমা সাকী আস সাফী (৭০১ হিঃ/১৩০২–৭৭৪ হিঃ/১৩৭৩)ঃ আল বিদাইয়াহ্ ওয়া আন নিহাইয়াহ্, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ।

ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ আল–কাজিয়িনী (২০৯ হিঃ/৮২৪–২৭৩ হিঃ/৮৮৭) ঃ আস–সুনান, দিল্লী।

ইবনুল কাইয়ীম, আবু আব্দুল্লাহ্, মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর, ইবনে কাইয়ামি আল জাওযিয়াহ আদ দিমাসাকী আস সাফী (৬৯১ হিঃ/১২৯২–৭৫১ হিঃ/১৩৫০)ঃ যাদু আল মাআদ, কায়রো, ১৯৫০।

ইবনে কুতায়বাহ্, আবু মুহাম্মদ, 'আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম আদ দীনাওয়ারী (২১৩ হিঃ/৮২৮–২৭৬ হিঃ/৮৮৯) আল ইমামাহ্ ওয়াস সীয়াসাহ্, কায়রো, ১৩৮৭ হিঃ/১৯৬৭, এবং বৈরুত, ১৪০১ হিঃ/১৯৮১।

ইবনে সা'দ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে, সা'দ আল বাগদাদী (১৬৮ হিঃ/৭৮৪–২৩০ হিঃ/৮৪৫) আত তাবাকাত্ (আল কাবীর), বৈরুত।

ইবনে সাকেরি, মুহাম্মাদ ইবনে সাকির আল কুতুবী (৭৬৪ হিঃ/১৩৬৩) ফাওয়াতু'ল ওয়াফায়াত্, বৈরুত, ১৯৭৪।

IRVING, Washington (1783-1859): Mahomet and His Successors, London, (Part of the Astor Prose Series), 1905.

আল জাসা'স, আবু বকর আহমেদ বিন 'আলী আর রাজী আল হানাফী (৩০৫ হিঃ/৯১৭–৩৭০ হিঃ/৯৮০) আহ্‌কামু' আল কোরান, ইস্তামবুল, ১৩৩৮ হিঃ

আল জাযরী, আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ (১২৯৯ হিঃ/ ১৮৮২–১৩৬০ হিঃ/১৯৪১) আল ফিক্‌হ 'আলা' আল মাদাহাহিবি' আল আরক 'আহ্', বৈরুত, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ।

আল খাতিব আল বাগদাদী, আবু বকর, আহমেদ, ইবনে আলী আস শাফিয়ী (৩৯২ হিঃ/১০০২–৪৬৩ হিঃ/১০৭২)ঃ তারীখ বাগদাদ, বৈরুত।

আল–খাতীব আল খাওয়ারাজমী, আবু আল–মু'য়াদ, মুয়াফফাক ইবনে আহ্মেদ আল–হানাফী (৪৮৪ হিঃ/১০৯১–৫৬৮ হিঃ/১১৭২) আল মানাকিব, আল নাযাফ আল আশরাফ, (ইরাক, ১৯৬৫ খৃঃ।

আল খাতীব আত–তাবরীজী, ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে, আবদুল্লাহ্ (৮শ' হিঃ/১৪শত শতাব্দী)ঃ মিসকাতু'আল মাসাবীহ্, Eng. to. James Robson, pakistan, 1975.

আল খাজিন, আলাউদ্দীন, আলী ইবনে মুহাম্মদ আল বাগদাদী, আস শাফিয়ী (৬৭৮ হিঃ/১২৮০–৭৪১ হি/১৩৪১)ঃ আত তাফসীর (লুবাবু'ত তাইল, ফী মা, আনি'ত তানজীল), কায়রো, ১৩৭৫ হিঃ/১৯৫৫।

আল খাজ্জাজ, আবু আল কাসিম মুহাম্মদ ইবনে আলী (৪শত হিঃ/৯ শতাব্দী)ঃ ফিকায়াতুল আথার, ইরান, ১৯৮১।

আল মাযলিসী, আল আল্লামাহ্, মুহাম্মাদ বাকির ইবনে মুহাম্মদ তাকী (১০৩৭ হিঃ/১৬২৮–১১১০ হিঃ/১৬৯৯) বিহারুল' আল আনওয়ার, তেহরান, ১৩৯২ হিঃ।

মালিক ইবনে আনাস, আবু আবদুল্লাহ্, আল আসবাহী আল মাদানী (৯৩ হিঃ/৭১২–১৭৯ হিঃ/৭৯৫) আল মুয়াত'তা, কায়রো, ১৩৫৩ হিঃ।

আল মাওয়ারদী, আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আস শাফিয়ী (৩৬৪ হিঃ/৯৭৪–৪৫০ হিঃ/১০৫৮) আল আহ্কামু 'স সুলতানিয়াহ্, কায়রো, ১৯৬৬।

MILLER, W.M., উল্লেখ্য আল আল্লামাহ্ আল হিল্লী।

MiR AHMED ALI, S.V. The Holy Quran, With Eng. transl. and Commentary. Karachi, 1964.

মীর খাওয়ান্দ, মুহাম্মদ ইবনে খাওযান্দ শাহ্ ইবনে মাহমুদ (৯০৩ হিঃ/১৪৯৮)ঃ রাওদাতু 'স–সাফা, নাওয়াল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্মনৌ।

আল মুফিদ, শেখ আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আন–ন'মান (৩৩৬ হিঃ/৯৪৮–৪১৩ হিঃ/ ১০২২)ঃ আল ইরশাদ, তেহ্রান; [English. tr. I.K.H. Howard, London, 1981].

আল মাগনিয়াহ্, মুহাম্মদ জাওয়াদঃ ফালসাফাত ইসলামিয়াহ্, দারু'ত তা'আরুফ, বৈরুত, ১৩৯৮ হিঃ/১৯৭৮

আল মুহাক্কিক আল হিল্লী, নাজমুদ্দীন, আবু আল কাসিম, জাফর ইবনে আল হাসান, ইবনে সাঈদ আল হুদহালী (৬০২ হি/১২০৬–৬৭৬ হিঃ/১২৭৭) ঃ শারা'হ'য়ূল–ইসলাম, (কিতাবু'ন নিকাহ্), আন নাযাফ আল আশরাফ, ইরাক, ১৯৬৯।

আল মুহিব আত তাবারী, মুহিবুদ্দীন, আবু আল আব্বাস, আহমেদ, ইবনে,

আবদুল্লাহ্, আস শাফিয়ী ৬১৫/১২১৮–৬৯৪ হিঃ/১২৯৫)ঃ দাখায়'রুল উকবা (ফী মানাকিবিদাউই' আল কুরবা, বৈরুত, ১৯৭৪।

মুসলিম, আবু আল হুসাইন, মুসলিম ইবনে আর হাজ্জাজ আন নায়সাবুরী (২০৪ হিঃ/৮২০–২৬১ হিঃ/৮৭৫)ঃ আস সহী, কায়রো।

আল মুততাকী আল–হিন্দী, আলাউদ্দীন, আলী ইবনে হুসামিদ্দীন (৮৮৫ হিঃ/১৪৮০–৯৭৫ হিঃ/১৫৬৭)ঃ কানজুল আম্মাল, হায়াদ্রাবাদ, ১৩৮৮ হিঃ/১৯৬৮।

নাজমু'ল হাসান, সৈয়দঃ আন নবুওয়া ওয়াল খিলাফাহ্, আলী হায়দারী, লাক্ষ্মৌ, ১৯৩৪।

আন–নাসায়ী, আবু আবদুর রহমান, আহমেদ বিন 'আলী আস শাফিয়ী (২১৫ হিঃ/৮৩০–৩০৩ হিঃ/৯১৫)ঃ আল–খাসাইসু আলআলাইয়াহ্, মিশর, ১৩৪৮ হিঃ।

নওয়াব আহ্মেদ হুসাইন খান, তারিখ আহমেদী হক ব্রাদার্স (মকতবা রিজভিয়া), লাহোর।

NICHOLSON, R.A. (1868–1945): A Literary History of the Arabs, Combridge, 1979.

আল কুমী, শেখ আব্বাস (১২৯৪/১৮৭৭–১৩৫৯/১৯৪১০ সাফিনাতুল বিহার আল নাযাফ আল আশরাফ ১৩৫৫ হিঃ।

আল–কান্দুজী, আস সৈয়দ সুলায়মান ইবনে ইব্রাহিম আল–হানাফী (১২২০ হিঃ/১৮০৫–১২৯৪ হিঃ/১৮৭৭): নায়াবুল–আল মাওয়াদ্দাত, ইসতামবুল, ১৩০১ হিঃ।

আর–রাদী, আস শারীফ, আবু আল হাসান, মুহাম্মদ ইবনে আল্ হুসাইন আল মুসায়ী ৩৫৯ হিঃ/৯৭০–৪০৬ হিঃ/১০১৫)ঃ নাহ্জুল–বালাগাহ্, বৈরুত ১৩৮৭ হিঃ/১৯৬৭।

আর রাজী, ফখরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ওমর আস শাফিয়ী (৫৪৪ হিঃ/১১৫০–৬০৬ হিঃ/১২১০) আত তাফসীরুল কাবীর, কায়রো, ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮।

রিজভীঃ নবী জীবনী, দারুস সালাম (তাঞ্জানিয়া) ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫।

Justice of God, মোমবাসা (কেনিয়া), ৩য় সংস্করণ, ১৯৮০।

আস সাদুক, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হুসাইন, (ইবনে বাবাওয়া আল কুমী (৩০৬ হিঃ/৯১৯–৩৮১ হিঃ/৯৯১) ইলালু'শ শারাঈ, আন নাযাফ আল আশরাফ, ১৩৮৫ হিঃ/১৯৬৬।

SEDILLOT, L.P.E.A. (1808-1875): Historie des Arabes, (Arabic tr. 'Adil Zu'aytir), Cairo, 1367/1948.

সীবতে ইবনে আল জাওযী, সামসুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে কিজাউগলী ইবনে আবদুল্লাহ্ আল হানাফী (৫৮১ হিঃ/১১৮৫-৬৫৪ হিঃ/১২৫৬)ঃ তাদকিরাত খাওয়াসি আল উম্মাহ্, বাহ্‌রুল-উলুম, পুনঃমুদ্রন. তেহরান।

সাদিক হাসান খাঁন, ১২৪৮ হিঃ/১৮৩২-১৩০৭ হিঃ/১৮৮৯)ঃ মানহাজ্জুল উসুল ইলা ইসতিলাহি হাদীসে রাসূল, শাহজাহানী প্রেস, ভারত।

সুবেহ আস-সালিহ, উলুমু'ল হাদিদ ওয়া মুসতালাহতুহ্, বৈরুত, ১৯৭৮।

আস সিউতী, জালালুদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ আস শাফিয়া (৮৪৯ হিঃ/১৪৪৫-৯১১ হিঃ/১৫০৫)ঃ লুবাবু'ন-নাকুল ফী আসবাবী'ন-নুজুল, দারু'ল-কিতাবিল-'আরাবী, বৈরুত।

তারীখুল খালিফা, কায়রো, ১৩৭১ হিঃ/১৯৫২ [Eng. tr. Major H.S. jarrett, under the title "history of the Caliphs" Karachi, 1977].-আদ-দুর্‌রে মানসুর, বৈরুত।

আত-তাবারী, ইবন্ জারীর, মুহাম্মদ (২২৪ হিঃ/৮৩৯-৩১০হিঃ/৯৩২)ঃ তারীখুল উম্মাহ ওয়াল মুলুক, লিডেন, ১৯৮০ এবং মিসর। - [আত-তাফসীর (জামি'উল-বায়ান ফী তাফসীরি আল কুরান), মিসর, বালাক, ১৩২৬ হিঃ]।

আত-তাফতাজানী, সাদুদ্দীন, মাসুদ ইবনে ওমর আস শাফিয়ী (৭১২ হিঃ/১৩১২-৭৯৩ হিঃ/১৩৯০) সারাহ্ আকাইদ নাসাফী, **ইস্তাম্বুল**, ১৩২৬। - শারহ'ল মাকাসিদি'ত-তালিবীন, ইসতাম্বুল, ১৩০৫ হিঃ।

আত-তাহায়ী, আবু জাফর, আহমেদ ইবনে মুহাম্মাদ আল হানাফী (২৩৯ হিঃ/৮৫৩-৩২ হিঃ/৯৩৩)ঃ মুসকিলু'ল আসান, হায়দারাবাদ, ১৩৩৩ হিঃ।

আত-তিরমিজিহ, আবু ঈশা, মুহাম্মদ ইবনে ঈশা, আস সুলামী (২০৯ হিঃ/৮২৪-২৭৯ হিঃ/৮৯২)ঃ আস সহী, কায়রো, ১২৯২ হিঃ।

ওযাহীদুজ্জামানঃ তাফসীর ওয়াহীদী, লাহোর।- আনোয়ারুল লুঘহা, ব্যাঙ্গালর, ১৩৩৪ হিঃ।

আল-ওয়াহিদী, আবু'ল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ আস-শাফিয়ী ৪৬৮ হিঃ/১০৭৬)ঃ আসবাবুন নুজুলু।

আল-ইয়াকুবী, ইবন ওয়াহিদ, আহমেদ ইবন ইসহাক (২৯২ হিঃ/৯০৫)ঃ আত- তারীখ, বৈরুত, ১৯৬০।

আজ-জামাখসারী, মাহমুদ ইবনে ওমর আল হানাফী (৪৬৭ হিঃ/১০৭৬-৫৩৮ হিঃ/১১৪৪)ঃ আত তাফসীর (আল-কাসসাফ) বৈরুত।